শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

কালের কোলে

প্রকাশক—
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র
লক্ষ্মীবিলাস পাব্লিসিং হাউস
১২ নং নারিকেল বাগান, কলিকাতা।

মূল্য ১৲ টাকা।

২৫ শে পৌষ ১৩২৪।

শ্রীবলাইচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

ত্রিপুরা— কলিকাতা

বোয়ালীয়াবারীর সাহিত্য-ভক্ত সহৃদয় জমিদার—

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু রমণীরঞ্জন রায়

চৌধুরীর করকমলেষু—

প্রিয় রমনীবাবু !

আমার বড় সাধের বড় আদরের "কালের-কোলে এতদিনে প্রকাশিত হইল। আপনি সাহিত্য-ভক্ত পাঠক, বঙ্গসাহিত্যে যে কোন পুস্তকই প্রকাশিত হউক না কেন আপনি তাহা সর্ব্বাগ্রে মহা আদরে পাঠ করিয়া থাকেন। যাবতীয় বাঙ্গালা পুস্তকে আপনার পাঠাগার পরিপূর্ণ। লক্ষ্মী সরস্বতীর মঙ্গল আশীষে আপনি গৌরবান্বিত। তাই আমি বড় আশায় আমার এ ক্ষুদ্র "কালের-কোলে" আপনারই নামের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলাম। কাল সময়ে আপনাকে আমাকে সকলকেই অজানা অচেনা দেশে লইয়া যাইবে কিন্তু যত দিন ভাষা থাকিবে তত দিন আমার এ ক্ষুদ্র "কালের-কোলে" আপনার নামটুকু বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিবে। ইতিঃ—

বিনীত—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

কালের-কোলে

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবাল্য এক সঙ্গে বর্দ্ধিত, একত্রে পালিত নরেন্দ্রনাথ যখন পঙ্কজিনীকে বিবাহ করিতে অসম্মত হইল, তখন যে শুধু তাহার পিতা দেবেন দত্ত বিস্ময়াপন্ন হইল তাহা নহে, অনেকেই মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল। দেবেনবাবু বহুদিন হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পঙ্কজিনীকে পুত্র নরেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন; কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে তাহাই যদি সকল সময় ঘটিত তাহা হইলে ভাবনার আর কিছুই থাকিত না, এই পৃথিবীই স্বর্গ হইত। এত অশান্তি, এত কোলাহল জগৎ জুড়িয়া অহর্নিশি উঠিত না,—এই সংসারটাই একটা শান্তি-কুঞ্জ হইয়া দাঁড়াইত।

যে দিন প্রথম পত্নী আসিয়া মুখখানা একেবারে কালি করিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "দেখ গা, নরু পঙ্কীকে বিয়ে কর্ত্তে চায় না।" সে দিন দেবেনবাবু কেবল যে পত্নীর মুখের দিকে কিছুক্ষণের জন্য একটা বিস্মিতভাবে চাহিয়াছিলেন তাহা নহে, কথাটা তাঁহার যেন একেবারেই

বিশ্বাস করিবার নয় বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তিনি নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

পত্নী কাত্যায়নী মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "সে কাল মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে চায় না। তার সমবয়সী সকলেরই সুন্দর বৌ হ'লো, আর তার যদি কালো বৌ হয় তবে লোকে বল্‌বে কি ? আর কারই বা বলো কাল মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে ইচ্ছে হয় ? তা বাপু ছেলের যখন অপছন্দ তখন তুমি পঙ্কীর জন্যে অপর কোন ছেলে দেখ। একটা যেমন তেমন ভালো ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেইতো হ'লো—তা হ'লেই তো তুমি দায় খালাস। নিজের ছেলের সঙ্গেই যে তার বিয়ে দিতে হবে এমন তো কোন লেখা পড়া নেই।"

এমন কোন লেখা পড়া নেই কথাটা যথার্থ বটে। পঙ্কজিনীর পিতামহ যখন অন্তিমশয্যায় দেবেনবাবুর হস্তে তাহার ক্ষুদ্র নাত্‌নিটিকে অর্পণ করিয়া যান, তখন কেবলমাত্র একটী সুপাত্রের হস্তে পঙ্কজিনীকে সমর্পণ করিতেই অনুরোধ করিয়াছিলেন, এমন কথা তাঁহার মুখ হইতে একবারও বাহির হয় নাই যে, তাঁহার একমাত্র পুত্র নরেন্দ্রর সহিত তাহার আশ্রয়চ্যুতা এই পথের ভিখারিণী মেয়েটির বিবাহ দিতে হইবে। এটা কেবল দেবেনবাবুই মনে মনে স্থির করিয়া এতদিন পর্য্যন্ত পঙ্কজিনীর বিবাহ বিষয়ে একেবারে উদাসীন হইয়াছিলেন। তাঁহার এ কথাটা একবারও মনে পড়ে নাই যে,

তাঁহার ইচ্ছার উপরেও আর এক শক্তি তাহার অসীম শক্তি লইয়া নেপথ্য হইতে কার্য্য করিতেছে, যাহার প্রভাবে কত আশা, কত ইচ্ছা সততই প্রাণের মাঝে শত প্রকারে আন্দোলিত হইয়াও আবার ধীর, স্থির, শান্ত হইয়া যাইতেছে।

ইচ্ছার গতিটায় সহসা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় দেবেনবাবু যে প্রাণে বেদনা পান নাই, এমন কথা হইতেই পারে না; কিন্তু তথাপি তিনি অতি শান্তভাবে বলিলেন, "আমি কারুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজই কখন করিনি, এটাও কর্ত্তে চাইনি। তবে আমার মতে নরেনের পঙ্ককেই বিয়ে করা উচিত ছিল। সে যাক্, সে যদি নিতান্তই তাকে বিয়ে কর্ত্তে নারাজ হয়, কাজেই আমাকে পঙ্কর জন্য অন্য কোন পাত্রের সন্ধান কর্ত্তে হবে। পঙ্কর বয়স হ'লো, আর তো দেরী করা চলে না।"

কথাটায় স্বামী যে বেদনা পাইলেন কাত্যায়নী যে তাহা না বুঝিলেন এমন নয়; তিনি মুখখানা একেবারে ভার করিয়া বলিলেন, "তা তুমি আর কি কর্ব্বে বল। নরেন যখন তাকে বিয়ে কর্ত্তে চায় না তখন তোমার আর দোষ কি? সে যা হক্ কিছু টাকা যদি বেশী খরচ হয় তাও না হয় করে দেখে শুনে একটি ভাল পাত্র দেখে পঙ্কর বিয়ে যত শীঘ্র পার দিয়ে ফেল। টাকা খরচ কল্লে ভালো পাত্রের অভাব কি? একটু চেষ্টা কল্লেই ঢের পাওয়া যাবে।"

"হুঁ তাই যা হক একটা কর্ত্তে হবে," দেবেনবাবু আরাম কেদারাখানার উপর চিৎ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অজানিত

ভাবে একটা গাঢ় নিশ্বাস নাসিকা পথে বাহির হইয়া আসিল। তাঁহার যেন কেবলই মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীটাতে প্রেম প্রীতি, কৃতজ্ঞতা স্নেহ,মমতা ভালবাসা কিছুই নাই,এ সকল কবির কল্পনা— একেবারে মিথ্যা। কেবল একমাত্র স্বার্থই সত্যরূপে সকলের দর্প চূর্ণ করিয়া দিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন সহসা তাঁহার চক্ষের সম্মুখে দুলিয়া উঠিল, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। স্বামীকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে দেখিয়া, কাত্যায়নী নীরবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পত্নীর একটা কথায়, যে পঙ্কজিনীর জন্য দেবেনবাবুর প্রাণটা এমন ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিল তাহার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। দেবেনবাবুর পিতার আমলের এক কর্ম্মচারী ছিল, তাহার নাম সনাতন। দেবেনবাবুর মাতা যখন স্বর্গারোহণ করেন তখন দেবেনবাবু অতি শিশু। তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর এই সনাতনই তাঁহাকে কোলে পিটে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। পত্নী শোকে দেবেনবাবুর পিতার মস্তিষ্ক একরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়। এই শিশু পুত্রটি কেমন করিয়া জীবিত থাকিবে, সে চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্কে একেবারেই স্থান পায় নাই। তিনি কাহারও মুখের দিকে না চাহিয়া সংসার ছাড়িয়া বিবাগী হইয়া চলিয়া যান। সংসারে আর এমন একটা লোক নাই যে, এই শিশুর ভার গ্রহণ করে। এ অবস্থায় দেবেনবাবুর পৃথিবীতে জীবিত থাকাই অসম্ভব হইত, যদি না সনাতন তাহার সমস্ত স্নেহ লইয়া বুক দিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিত। পঙ্কজিনী সেই সনাতনের একমাত্র পৌত্রী।

দেবেন্দ্রনাথ সাবালক হইবার পর সনাতন দেশে চলিয়া গিয়াছিল; বহুদিন আর সে কলিকাতায় আসে নাই। কিন্তু দেবেনবাবু সনাতনের ঋণ ভুলিতে পারেন নাই। তাহাকে তিনি পিতার ন্যায়ই ভক্তি করিতেন। সে দেশে চলিয়া গেলে, তিনি তাহার সমস্ত ব্যয় মাসে মাসে মনিঅর্ডার যোগে নিয়মিত পাঠাইয়া দিতেন। এই অবস্থায় কয়েক বৎসর কাটিয়া যাইবার পর সহসা একদিন সনাতন তাহার ক্ষুদ্র নাত্‌নিটীর হস্ত ধরিয়া দেবেনবাবুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। দামুদরের বন্যায় তাহার ঘর বাড়ী জোতজমা সকলি গিয়াছে, এমন কি তাহার পুত্র পুত্রবধূও সেই জলস্রোতের সহিত শেষ যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুর কোলে চির শান্তি লইয়াছে। কেবল বহুকষ্টে সে এই ক্ষুদ্র পৌত্রিটীকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বহুদিন পরে আবার সনাতনকে দেখিয়া আনন্দে দেবেন-বাবুর প্রাণটা একেবারে ভরিয়া গেল, কিন্তু তাহার বিপদের কাহিনী শুনিয়া প্রাণে সত্যই গুরুতর আঘাৎ পাইলেন, তাঁহার নয়নে জল আসিল। সনাতনকে বাড়ীর কর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার ক্ষুদ্র নাতনিটীকে তাঁহার একমাত্র পুত্রের সঙ্গিনী করিয়া দিলেন। তখন পঙ্কজিনীর বয়স সাত বৎসর আর নরেন্দ্রের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। তাহার পর ছয় বৎসর কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এই ছয় বৎসরের মধ্যে কত পুরাতন কীর্ত্তি,—পুরাতন স্মৃতি ধরার অঙ্গ হইতে মুছিয়া গিয়াছে, আবার কত নূতন সামগ্রী নূতন আলোয়—

নূতন ভাবে পৃথিবীর বক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এই ছয় বৎসরের ভিতরেই প্রভুভক্ত সনাতন পৃথিবীর নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পুত্র পুত্রবধূর অস্বাভাবিক মরণে বৃদ্ধের পুরাতন দেহের সমস্ত খিলই খুলিয়া গিয়াছিল। কলিকাতায় আসিবার পর জোড়াতাড়া দিয়া কোন ক্রমে এক বৎসর সে দেহটাকে জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়া ছিল, তাহার পর তাহা একেবারেই অচল হইয়া পড়িল। কয়েকদিন টাল বেটাল খাইবার পর একদিন শেষ রাত্রে সে পৃথিবীর নিকট চির বিদায় লইল; তাহার বড় আদরের ক্ষুদ্র নাতনিটীকে দেবেনবাবুর হস্তে অর্পণ করিয়া চিরদিনের মত সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। মহা যাত্রার পূর্ব্বে সনাতন অশ্রুপ্লুত নয়নে দেবেনবাবুর দুই হস্ত ধরিয়া বলিয়া ছিল, "ছোটবাবু পঙ্ক রইলো, ওর আর কেউ নেই। দেখবেন যেন দুটো অন্নের জন্য ও না মারা যায়। একটি সৎপাত্রের হাতে ওকে অর্পণ করবেন।"

পুত্রের মুখ চাহিয়া বড় উৎসাহে বৃদ্ধের মৃত্যু শিয়রে দেবেনবাবু বলিয়াছিলেন, "সনাতন পঙ্কজিনীর জন্য তুমি একটুও ভেব না। তোমার নাতনী, সে যে আমার নিজের মেয়ের চেয়েও বড়।"

আজ প্রায় পাঁচ বৎসর সনাতন চলিয়া গিয়াছে, এই পাঁচ বৎসর দেবেনবাবু মনে মনে কত আশার অট্টালিকা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পুত্রের সহিত পঙ্কজিনীর বিবাহ দিয়া সনাতনের ঋণের কতকটা শোধ করিবেন এইটাই চিরদিন ভাবিয়া আসিয়া-

ছিলেন, তাঁহার চিন্তাটা কেবল একদিক দিয়াই বহিয়া আসিয়াছে। তাহার যে আর একটা দিক আছে, সে কথাটা তাঁহার একদিনের জন্যেও মনে হয় নাই। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুত্র যে কোন দিন একটা স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে, দেবেনবাবু একদিনের জন্যও একথাটা একেবারেই ধারণা করিতে পারেন নাই। আজ সহসা তাঁহার মস্তিষ্ক একেবারে আলোড়িত হইয়া গেল। কেন যে তিনি এই সামান্য কথাটা একবারও চিন্তা করেন নাই, এইটা ভাবিয়া তাঁহার নিজের উপর নিজেরই ঘৃণা হইতে লাগিল। বাল্যের অনেক স্মৃতি,—এই পাঁচ বৎসরের অনেক পুরাতন কথা একে একে আসিয়া তাঁহার হৃদয়পটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার চিন্তা করিবার শক্তিটা পর্য্যন্ত যেন লুপ্ত হইবার মত হইল, তিনি মড়ার মত সেই আরাম কেদারাখানার উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিলেন।

দেবেনবাবু কতক্ষণ সেই ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই, সহসা পঙ্কজিনীর মধুর স্বরে তাঁহার যেন চেতনা হইল। তিনি চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিলেন। দেবেন-বাবুকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া পঙ্কজিনী তাহার মধুর হাসিতে সমস্ত ঘরখানি মধুময় করিয়া বলিল, "জ্যাঠামশায়, আজ আপনি নাইবেন খাবেন না, বেলা যে অনেক হয়েছে ?"

দেবেনবাবু পঙ্কজিনীর এই সহজ কথাটার উত্তরও আজ সহসা দিতে পারিলেন না। কেবল একবার মাত্র তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টিতে কত স্নেহ, কত মমতা। পঙ্কজিনী

সে চাহনী সহ্য করিতে পারিল না, চক্ষু নত করিল। তাহার বর্ণ গৌরবর্ণ না হইলেও একেবারে কৃষ্ণবর্ণ নহে; শ্যামবর্ণ বলিলেও বলিতে পারা যায়; কিন্তু তাহার মুখখানিতে যে কোমলতা মাখান ছিল তাহা পৃথিবী ঢুঁড়িয়াও মেলা সম্ভব নয়। তাহার বিস্তৃত চক্ষু দুইটি, তাহার সুন্দর মুখখানিতে যেন স্বর্গের শোভা ছড়াইয়া রাখিয়াছে। আর কেশ—এমন সুন্দর কুঞ্চিত ঘন কৃষ্ণ কেশ কদাচিৎ কখন কাহারও দেখিতে পাওয়া যায়! তাহা যেন পায়ের গোড়ালি স্পর্শ করিবার জন্য ব্যস্ত। দেবেনবাবু সেই ক্ষুদ্র মুখখানির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন আর মনে মনে বলিতেছিলেন, "মূর্খ অন্ধ পুত্র, এ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইল না। এ রূপ যে রাজার ঘরণী হইবার!"

পঙ্কজিনী নীরবে কিয়ৎক্ষণ অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে আবার বলিল, "জ্যাঠামশাই আজ কি আপনার কোন অসুখ করেছে—এত ভাবছেন কি?"

দেবেনবাবু এবার কথা কহিলেন, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "না মা, অসুখ বিসুখ কিছুই করেনি, তবে ভাবছি কি শুনবে মা! ভাবছি অনেক, ভাবছি তোমার কথাই। তোমার বয়স হ'লো, আরতো মা তোমায় রাখতে পারিনি। এখন কেমন ক'রে তোমায় একটি সৎপাত্রের হস্তে অর্পণ কর্ব্বো সেইটাই আমার সব চেয়ে বেশী ভাবনা।"

এ কথায় পঙ্কজিনী কি উত্তর দিবে? সে নীরবে মুখখানি নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেবেনবাবু বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু

ভেবে যে মা মানুষ বিশেষ কিছু কর্ত্তে পারে তা তো বলে বোধ হয় না। আমিতো অনেক ভেবেছিলাম, কিন্তু কই ভাবনার তো কিছুই ফল হ'লো না। কিন্তু না ভেবেও তো মানুষ বাঁচতে পারে না, তবুও ভাবতে হয়।"

পঙ্কজিনী দেবেনবাবুর কথায় বাধা দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "চলুন জ্যাঠামশাই স্নান করবেন চলুন, বেলা যে ঢের হ'লো।"

দেবেনবাবু একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া কেবল মাত্র বলিলেন, "চল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মায়ের আদরের পিতার এক মাত্র পুত্র নরেন্দ্রনাথের গুণ যতই থাক্, লোকটা বড় খাম খেয়ালি ছিল। খেয়ালের বসে এমনি সহসা এক একটা কাজ করিয়া বসিত যে, নির্ব্বোধ আখ্যাটা যেন তাহার কেনা হইয়া গিয়াছিল। কাজ এলোমেলো করিতে তাহার জুড়ি পাওয়া দুষ্কর। দশজনে মিলিয়া হয়তো একটা কাজ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে, ঠিক সেই সময় যদি কোন ক্রমে নরেন্দ্র আসিয়া তাহাতে যোগ দিল, অমনি সমস্ত কাজ একেবারে এলোমেলো হইয়া যাইত। পাঠশালা হইতে স্কুল, স্কুল হইতে এক্ষণে সে কলেজে পড়িতেছে, কিন্তু সে তাহার নির্ব্বোধ আখ্যাটা এ পর্য্যন্তও ঘুচাইতে পারে নাই। পঙ্কজিনী দিন রাত গুছাইয়াও নরেন্দ্রনাথের ঘরখানাকে আর কিছুতেই গুছাইয়া উঠিতে পারিত না। হয়তো পাঁচ মিনিটও হয় নাই পঙ্কজিনী প্রায় দুই ঘণ্টা কাল পরিশ্রম করিয়া তাহার গৃহটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া আসিয়াছে, আর যেমনই নরেন্দ্রনাথ একবার মাত্র তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে আর অমনি যেই কে সেই। এটা টানিয়া ওটা নাড়িয়া, বিছানা ধামসাইয়া পুস্তক ছড়াইয়া ঘরখানাকে এলোমেলো না করিয়া সে যেন সুস্থির হইতে পারিত না।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, আকাশ তারার মালা পরিয়া অন্ধকারের

কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ তাহার পড়িবার ঘরের ভিতর একখানা সোফার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল। প্রায় এক ঘণ্টার উপর সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু তখন পর্য্যন্ত গৃহের একটি জিনিষও স্থানচ্যুত হয় নাই। বর্ণ পরিচয়ের সুবোধ বালক গোপালের মত গৃহে প্রবেশ করিয়া একেবারে একখানি পুস্তক লইয়া বসিয়া ছিল। এতটা সুবোধ হইবার একটা কারণও ছিল, আজ কয়েকদিন হইতে তাহার বিবাহ লইয়া একটা মহা গোল উঠিয়াছে। নানা জনে নানা কথা কহিতেছে। তাহার এক আধটা যে তাহার কর্ণেও প্রবেশ করে নাই তাহাও নহে। এই সকল কারণে তাহার মেজাজটা আজ কয়েকদিন হইতে একেবারেই খিচড়াইয়া গিয়াছিল। প্রাণটা অস্থির হওয়ায় সে একেবারে সুস্থির হইয়া পড়িয়াছিল; এমন কি এই কয়েকদিন হইতে সে কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহে নাই। এই সকল গোলমালে পড়িয়া তাহার এলোমেলো ভাবটা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথ একমনে নিবিষ্টচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেছিল, সহসা চুড়ির শব্দে সে মস্তক তুলিয়া দ্বারের দিকে চাহিল। দেখিল হাসিতে হাসিতে পঙ্কজিনী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। এই মেয়েটাকে লইয়াই যত গোল বাধিয়াছে। পঙ্ককে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া আজ যেন নরেন্দ্রনাথের কেমন একটা রাগ হইল। মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া সে আপন মনে পুস্তক পাঠ করিতে লাগিল। পঙ্ক গৃহের ভিতর প্রবেশ

করিয়া এক গাল হাসিয়া বলিল, "ওগো মশাই, পড়া রাখুন, জ্যাঠামশাই ডাক্‌ছেন ?"

পঙ্কজিনীর কথাটা শেষ হইতে না হইতেই নরেন্দ্রনাথ তাঁহার হস্তস্থিত পুস্তকখানা এক পার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া একেবারে সোফার উপর চড়াৎ করিয়া উঠিয়া বসিল। বেশ একটু রাগত স্বরে উত্তর দিল, "ওগো মশাই কি! আমি কি তোমার ওগো মশাই ? কাকে যে কি বলতে হয়, সে জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত নেই। এত বড় মেয়ে, যদি একটুও বুদ্ধি থাকে!"

নরেন্দ্রনাথের ভাবে পঙ্ক প্রথমে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া সে না হাসিয়া আর থাকিতে পারিল না, একেবারে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে কোন ক্রমে বলিল, "তবে কি বলতে হবে মশাই ?"

পঙ্কজিনীর হাসিতে নরেন্দ্রনাথের রাগটা আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছিল, সে বিরক্ত ভাবে মুখখানাকে বিকৃত করিয়া ভেঙ্গচাইয়া উঠিল, "তবে কি বলতে হবে মশাই !"

পঙ্কজিনী কোন কথা কহিল না, কেবল খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ একটু নীরব থাকিয়া পুনরায় বেশ গম্ভীরভাবে বলিল, "বল্‌তে হবে কি তাও জান না! বলতে হবে নরেনদাদা জ্যাঠামশাই তোমাকে ডাক্‌ছে।"

পঙ্কজিনী তাহার হাসি বন্ধ করিয়া মুখখানা ভার করিয়া উত্তর দিল, "তা আমায় আগে শিখিয়ে দিতে হয়। আমার কি দোষ বল ?"

"দোষ নয়," নরেন্দ্রনাথ সোফার উপর হাতখানা সজোরে চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "একশো বার দোষ। আমিতো পড়ছিলুম, তুমি যে ঘরে ঢুকেছ তাই আমি জান্‌তে পারিনি। তুমি কি আমায় জিজ্ঞেসা করেছিলে যে বলে দেব? একেবারেইতো ফস্‌কোরে বলে বস্‌লে মশাইগো।"

পঙ্কজিনী তাহার অঞ্চলটা গলায় বেষ্টন করিয়া করজোড়ে বলিল, "দোষ হয়েছে, ঘাট্ হয়েছে, অপরাধ মাপ করুন।"

চিরকাল একটা না একটা নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য পঙ্কজিনীর নিকট নরেন্দ্রনাথই তাড়া খাইয়া আসিতেছিল, আজ পঙ্কজিনীকে অপরাধের জন্য তাহার নিকট মাপ চাইতে দেখিয়া তাহার ভারি আনন্দ হইল; সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কেমন, আমায় যে বড় নির্ব্বোধ বলা হয়; নির্ব্বোধ তুমি নও। আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি মানুষ মাত্রেই নির্ব্বোধ।"

আজ ছয় সাত বৎসর এক সঙ্গে পাশে পাশে থাকিয়া পঙ্কজিনী নরেন্দ্রনাথকে যেমন চিনিয়াছিল, তেমনটী বোধ হয় আর কেহ তাহাকে চিনিতে পারে নাই। সে জানিত নরেন্দ্রনাথের মত ভালো মানুষ লোকের আজকালের পৃথিবীর সহিত কিছুতেই খাপ খাইতে পারে না। এই স্বার্থভরা পৃথিবীতে যখন সকলেই সকলের অনিষ্ট করিতে ব্যগ্র, তখন তাহার ন্যায় ভালো মানুষ লোকের নির্ব্বোধ উপাধি লওয়া ব্যতীত উপায় ছিল না। আষ্টে-পৃষ্ঠে কাজ করা কাশ্মিরী জামিয়ার তাহার মূল্য যতই হউক না কেন আজকালকার দিনে তাহা ব্যবহার করিলে যেমন লোকের

নিকট কেবল হাস্যস্পদ হইতে হয় নরেন্দ্রনাথের অবস্থাও কতকটা সেই ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে চিরকাল নির্ব্বোধ হইয়া আসিয়াছে ও চিরদিন নির্ব্বোধ হইবে সে বিষয়ে পঙ্কজিনী একেবারে স্থির নিশ্চিত ছিল; তাই সে তাহাকে একটু চালাক করিবার জন্য নানাভাবে উদ্ব্যস্ত করিত, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ উন্নতির দিকে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইতে পারে নাই।

নরেন্দ্রনাথ নীরব হইবামাত্র পঙ্কজিনী বলিল, "বুঝেছি ঢের হয়েছে। আপনার মত বুদ্ধিমান লোক জগতে আর একটীও নেই। আজ থেকে আপনার খেতাব হ'লো বুদ্ধিরাজ।"

নরেন্দ্রনাথ পঙ্কজিনীর কথার মাঝখানেই বলিতে যাইতেছিল, "তা—"

পঙ্কোজিনী তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "আর তাতে কাজ নেই, এখন জ্যাঠামশাই ডাকছেন যাওয়া হবে কি?"

"নিশ্চয়" নরেন্দ্রনাথ সোফা ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইল। সে গৃহ হইতে বাহির হইতেছিল কিন্তু আবার ফিরিয়া দাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা এখন বাবা আমায় হঠাৎ ডাক্‌লেন কেন?"

পঙ্কজিনী বলিল, "তা আমি কেমন করে বল্‌বো বল? আমিতো আর গুণ্‌তে জানিনে?"

নরেন্দ্রনাথ আবার ধীরে ধীরে সোফার উপর বসিয়া পড়িল। বেশ একটু ভারিক্যের মত মাথাটা নাড়িতে লাগিল। পঙ্কজিনীর কথায় কোন উত্তর দিল না। তাহার ভাব দেখিয়া পঙ্কজিনী আবার হাসিতে হাসিতে বলিল, "এখন যাবে, কি যাবেনা, যা

হয় একটা বলে দাও। আমি আর দেরী কর্ত্তে পারিনে, জ্যাঠামশাই হয়তো কত রাগ করছেন ?”

নরেন্দ্রনাথ বিরক্তভাবে উত্তর দিল, “তবে আর মেয়ে মানুষ বলেছে কেন ? মেয়ে মানুষের যদি কোন বুদ্ধি থাক্‌তো তা হ’লে আর ভাবনা কি ! বাবা যখন আমায় এমন অসময় ডেকেছেন তখন নিশ্চয়ই কোন একটা গুরুতর কাজ আছে, সে কাজটা যে কি, যাবার আগে তা আমার একটু ভেবে নেওয়া নিশ্চয়ই উচিত ?”

“তবে তুমি বসে বসে তাই এখন ভাবো,—আমি জ্যাঠামশাইকে সেই কথাই বলিগে,” পঙ্কজিনী চলিয়া যাইবার জন্য ফিরিয়াছিল কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি বলিল, “না, না একটু দাঁড়াও। বুঝেছি,—নিশ্চয়ই বাবা আমার বিয়ের কথাই বলবেন।”

তারপর সে পঙ্কজিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বেশ একটু কিন্তু হইয়া বলিল, “আচ্ছা পঙ্ক, এই যে আমি তোকে বিয়ে কর্ত্তে অসম্মত হচ্ছি, এতে কি তোর কোন দুঃখ হচ্ছে। তা ভাই দুঃখ হ’লেই বা আর কি কচ্ছি। আমি কেন্ শুধু শুধু একটা কালো মেয়ে বিয়ে করবো ?”

নরেন্দ্রর কথায় পঙ্কজিনীর মুখখানি একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছিল, সে একটা তীব্র কটাক্ষে নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া বেশ একটু অভিমান জড়িত স্বরে বলিল, “তোমাকে তো কেউ পায়ে ধরে সাধ্‌ছে না।”

পঙ্কজিনী একেবারে হন্ হন্ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া

যাইতেছিল কিন্তু কাত্যায়নীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাকে আবার থম্‌কাইয়া দাঁড়াইতে হইল। কাত্যায়নী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "হাঁরে নরু, তুই এখানে বসে রইছিস্‌,—উনি যে তোকে সন্ধ্যে থেকে খুঁজ্‌চেন।"

নরেন্দ্র কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পঙ্কোজিনী বেশ একটু রাগতঃ স্বরে বলিল, দেখনা জ্যেঠাইমা, আমি সে কথা কখন থেকে বলছি, ও আর রার হয় না।"

কাত্যায়নীকে লোকে মাটীর মানুষ বলিত। যথার্থই তিনি মাটীর মানুষ ছিলেন। তাঁহার মনের দরজায় বিশেষ একটা কোন কড়া পাহারা ছিল না। তাহাকে যে যাহা বলিত তিনি তাহাই বেশ সরল ভাবে বুঝিয়া যাইতেন। ভগবান তাঁহাকে কেবল যেন জননী করিয়াই গড়িয়াছিলেন,—তাহাতে ছিল কেবল অফুরান্ত মাতৃ-স্নেহ। তাঁহার মোটা সোটা থলথলে দেহটীতে এমন একটী জিনিষ ছিল যাহাতে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। পঙ্কোজিনীর কথায় তিনি ব্যাকুলভাবে পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনরে আজ তোর কি হয়েছে? কোন অসুখ বিসুখ করেনিতো? দেখি তোর গা।"

নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিল, "না মা,—শুধু শুধু অসুখ বিসুখ হবে কেন। দেখ মা পঙ্কর একেবারে বুদ্ধি শুদ্ধি নেই। ওর কথার কোন মানেই হয় না।"

কাত্যায়নী বলিলেন, "ওর যে বুদ্ধি শুদ্ধি নেই তা কি আর বাছা আমি জানিনে, ও চিরকালই ওই রকম।

পঙ্কজিনী বঙ্কিমভাবে নরেন্দ্রের প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিল, "কার কথার মানে হয় না, তা জ্যাঠাইমা বেশ জানেন। নইলে আর বল শুধু শুধু অসুখ হবে কেন। অসুখ বুঝি আবার কারুর নাকি বলে কয়ে হয়? অসুখ যখন হয় তখন শুধু শুধুই হয়।"

কাত্যায়নী পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমারও বাপু কোন বুদ্ধি শুদ্ধি নেই,—সেই জন্যই তো আমার এত ভাবনা। এত বড় ছেলে হ'লে এখন নিজের অসুখটা পর্য্যন্ত বোঝবার ক্ষমতা হ'লো না। এখন চল যাই দেখিগে আবার উনি তোমায় খুঁজছিলেন কেন?"

"না আমার বুদ্ধি নেই বই কি!" নরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল।

কাত্যায়নী আর কথা কহিলেন না,—তিনি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার স্বামীর গৃহের দিকে চলিয়া গেলেন। নরেন্দ্র ও কাত্যায়নী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে, পঙ্কজিনী ধীরে ধীরে যাইয়া সোফার উপর বসিল,—তাহার পর নরেন্দ্রের সেই পরিত্যক্ত পুস্তকখানা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র পঙ্কজিনীকে বিবাহ করিতে চাহে না, এই কথাটা যে দিন হইতে দেবেন দত্তের কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই তাঁহার প্রাণের শান্তি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। দেবেন দত্তের স্বভাবটা ছিল শান্তি প্রিয়; তিনি চিরকালই কোন একটা ভাবনা চিন্তার মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতে একেবারেই অনভ্যস্ত ছিলেন। ভাবনা চিন্তার তাঁহার বড় একটা বিশেষ কারণও ছিল না। মানুষের যাহা যাহা প্রয়োজন,—যাহার জন্য মানুষের ভাবনা চিন্তা, তাহার কোনটারই তাঁহার অভাব ছিল না। মনের মতন পত্নী,—সরল শান্ত পুত্র,—বিষয় সম্পত্তি জমিদারী;—তাঁহার অভাব কি! তিনি চিন্তা করিবেন কেন? কিন্তু আজ কয়দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে যে চিন্তার তুমুল তুফান উঠিয়াছে, তাহার যেন কূল কিনারা নাই। তিনি যেন একেবারে চিন্তা-সাগরে ওতপ্রোত খাইতেছিলেন। তিনি নানা ভাবে সাঁতরাইয়াও কিছুতেই আর কিনারায় উঠিতে পারিতেছিলেন না। কেমন করিয়া তিনি একটী সুপাত্রের হস্তে পঙ্কজিনীকে সমার্পণ করিবেন,—কেমন করিয়া তিনি তাঁহার শেষ কর্ত্তব্য হইতে উদ্ধার পাইবেন! পঙ্কজিনীর রং একটু কালো;—আজকালকার দিনে একেই সুপাত্র পাওয়া কঠিন,—তাহার উপর কন্যার রং যদি ময়লা হয় তাহা হইলেতো একেবারে

সর্ব্বনাশের ব্যাপার। পাত্র মেলাই দুর্ঘট। যদি কোন সৎ-পাত্র না মিলে তখন তিনি কি করিবেন? জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া তিনি পঙ্কজিনীকে একটা অসৎপাত্রে অর্পণ করিবেন?

দেবেন দত্ত তাঁহার শয়ন কক্ষের ভিতর সুন্দর পালঙ্গের উপর রাজহংসের পালকের ন্যায় শুভ্র শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সেদিনও এই সকল কথাই চিন্তা করিতেছিলেন,—আর ভাবনার কৃষ্ণবর্ণ চিত্র বিকট দৈত্যের মত তাঁহার সম্মুখে একে একে আসিয়া তাঁহাকে একেবারে দিশেহারা করিয়া ফেলিতেছিল। গৃহখানি মূল্যবান আসবাব পত্রে পরিপূর্ণ। গৃহের ভিতর উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে। কিন্তু বিজুলীর সে প্রদীপ্ত আলোও তাঁহার প্রাণের কালো ঘুচাইতে পারে নাই। আজ কয়েক দিন হইতে যে গাঢ় অন্ধকার ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ের ভিতর পুঞ্জিভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এমনি বিরাট, এমনি ভরাট, যে জগতের সমস্ত আলোক যেন ধীরে ধীরে তাঁহার নয়নের সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতেছিল। পঞ্চপাণ্ডব নিধনের নিমিত্ত পঞ্চশর হারাইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভীষ্মদেব যেমন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, আজ দেবেনবাবুর অবস্থাও কতকটা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি কি করিবেন, কি না করিবেন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল, কহিনুর ফেলিয়া মানুষ কাচ চায় কেন? এ কেনর উত্তর কে দিবে? এ রহস্য কেবল অন্তর্য্যামীই ভেদ করিতে পারেন।

বহুক্ষণ পড়িয়া পড়িয়া এই একঘেয়ে চিন্তায় দেবেন দত্তের

প্রাণটা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি তাঁহার চিন্তার স্রোতটাকে অন্যমুখে ফিরাইবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য তিনি পালঙ্গ হইতে নামিতে যাইতেছিলেন ;—সেই সময় কাত্যায়নী নরেন্দ্রকে লইয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া দেবেন-বাবুর প্রাণটা একেবারে সজোরে স্পন্দিত হইয়া উঠিল, আশু অমঙ্গলের সূচনা হইলে প্রাণটা যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া দেবেনবাবুর প্রাণটাও যেন সেই ভাবে ব্যাকুল হইয়া প'ড়ল। তিনি কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কথা বাহির হইল না। কাত্যায়নী বলিলেন, "হ্যাঁগা, তুমি নরেনকে খুঁজ্‌ছিলে কেন ?"

দেবেনবাবু নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "হ্যাঁ, একবার সেই কথাটা ভালো করে জিজ্ঞাসা করে নেবো ব'লে।"

কাত্যায়নী স্বামীর মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন ; বলি-লেন, "কোন্ কথাটা গা ?"

দেবেনবাবু পত্নীর কথার কোন উত্তর দিলেন না,—তিনি পুত্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "নরেন,—আমি তোমায় ডেকে-ছিলেম্ একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্যে। তোমার মা বল্‌ছিলেন তুমি নাকি পঙ্ককে বিয়ে কর্ত্তে রাজি নও,—এ কথাটা কি সত্যি ?"

পালঙ্গের একটা ছত্রি ধরিয়া নরেন্দ্র দাঁড়াইয়া ছিল,—সে

পিতার কথার কোনই উত্তর দিল না,—কাত্যায়নী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আমি কি তোমায় মিছে কথা বলেছি,—নরুইতো সেদিন আমায় বল্লে, না মা আমি পঙ্কীকে বিয়ে করবো না,—ওযে কালো! সত্যি মিথ্যে ওর মুখেই শোন না।"

দেবেনবাবু পুত্রের মুখ হইতে একটা কিছু শুনিবার জন্য কিছুক্ষণ নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু পুত্রকে নীরব দেখিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "তা হ'লে কথাটা যথার্থ! কিন্তু আমার মতে তোমার পঙ্ককেই বিয়ে করা উচিত ছিল। তার রং একটু কালো বটে কিন্তু অমন লক্ষ্মী মেয়ে হাজারে একটা পাওয়াও কঠিন। মাকে আমার ভগবান কহিনুর দিয়ে তৈরী করেছেন। মায়ের যে আমার কত গুণ তা কেবল আমিই জানি।"

দেবেনবাবুর কণ্ঠস্বর ক্রমেই গাঢ় হইয়া আসিতেছিল,—একটা নিবিড় স্নেহের উচ্ছ্বাসে তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছিল,—তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। মাতৃহারা, আশ্রয়চ্যুতা তাঁহার বড় আদরের সেই ক্ষুদ্র মেয়েটীকে তিনি কেমন করিয়া পরের ঘরে পাঠাইয়া দিবেন সেই কথাটা সহসা তাঁহার মনে হওয়ায়, নয়ন-পল্লব সিক্ত হইবার উপক্রম করিল, তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। কাত্যায়নী স্বামীর মুখের পানে চাহিয়াছিলেন; তিনি স্বামীর গাঢ় স্বরে প্রাণে বেদনা পাইলেন,—অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "তা হকৃগে কাল,—উনি যখন বল্‌ছেন, নরু তুই পঙ্কীকেই না হয় বিয়ে কর।"

পত্নীর কথায় বাধা দিয়া দেবেনবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "না,—সে কথা আমি নরেনকে বল্‌তে চাইনে। যাকে জীবনের সঙ্গিনী কর্ত্তে হবে,—যাকে সঙ্গে নিয়ে চিরদিন সংসার কর্ত্তে হবে,—যে জীবনের সুখ দুঃখের সমভাগিনী হবে তাকে যদি গোড়ায়ই অপছন্দ হয় তা হ'লে জীবনে কোনদিনই সুখ হতে পাবে না। আমি এ বিষয় কখন কারুকে জোব কর্ত্তে পারিনে। এতে আমার মতামত যেটুকু, কেবল সেইটুকুই আমি বল্‌তে পারি।"

নরেন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিল,—উচিত অনুচিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা তাহার কোন দিনই ছিল না। তাহার বন্ধুবর্গের সকলেরই গৌরবর্ণ পত্নী হইয়াছে, তাহার কেন হইবে না? পঙ্কজিনী যে তাহার কতখানি আপনার,—সে যে তাহার প্রাণের কতখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে তাহা ধারণা করিবারও তাহার ক্ষমতা ছিল না। সে কালো মেয়ে বিবাহ করিতে চায় না, কিন্তু কেন যে চায় না, তাহাও সে বলিতে পারে না। পিতার কথায় তাহার প্রাণে যেন কেমন একটা নূতন তরঙ্গ জাগিয়া উঠিতেছিল,—সে তরঙ্গে তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে দুলিতে লাগিল। দেবেনবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া আবার অতি শান্ত কোমল স্বরে বলিলেন, "নরেন, আমি তোমায় পঙ্ককে বিয়ে কর্ত্তে অনুরোধ করছিনে, তবে আমার বিশ্বাস তুমি তাকে বিয়ে কল্লে ভাল কাজই কর্ত্তে,—যাক্ আমি তোমাকে তিন দিন সময় দিলুম, বেশ ভালো করে একটু বিবেচনা করে দেখ। তারপর কি ঠিক কল্লে তোমার মাকে বলো।"

বিবেচনা টিবেচনা প্রভৃতি বড় বড় কথায় নরেন্দ্রের প্রাণটা যেন ক্রমেই হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। পিতার কথা শেষ হইবামাত্র সে আর এক মুহূর্ত্তও তথায় দাঁড়াইল না, শান্ত সুবোধ বালকের মত যেমন ভাবে সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আবার ঠিক সেইভাবেই একটাও কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। মাঝে হইতে কতগুলা আবর্জ্জনায় যেন তাহার প্রাণটা একেবারে ভরিয়া উঠিল। তাহার তখন কেবলই মনে হইতেছিল, "এত বিবেচনা টিবেচনার হাঙ্গাম করার চেয়ে পঙ্কীকে বিয়ে করাই ঢের ভালো।"

পুত্র গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবামাত্র দেবেনবাবু পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি পঙ্কীর বিয়ের জন্য এত করে ভাবতুম না। দেখে শুনে একটী সৎপাত্রের হাতেই পঙ্ককে অর্পণ কর্ত্তেম; কিন্তু ছেলেবেলা থেকে সে নরেনের পাশে পাশে থেকে বড় হয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই সে জানে, নরেনের সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। তাই সে মনে মনে যে ছবি গড়ে তুলেছে, তা যদি আজ সহসা ভেঙ্গে যায়, তা হ'লে তার ক্ষুদ্র প্রাণ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সে আঘাৎ সে কিছুতেই সহ্য কর্ত্তে পারবে না। তা ছাড়া আমি জানি, নরেনকে সে যত ভালবাসে তত ভালবাসা সে আর কারুর কাছেই পাবে না। সনাতন বড় বিশ্বাস করে তার প্রাণের নাতনিটিকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে,—আমি তো তাকে মেরে ফেলতে পারিনে।"

স্বামীর কথার অর্থ কাত্যায়নী কিছু বুঝিলেন কি না

বলা যায় না, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, "তা তুমি যা ভালো বিবেচনা কর্ব্বে তাই হবে। নরু ছেলে মানুষ ওর কি বুদ্ধি শুদ্ধি আছে। ভালো মন্দের ও কি জানে। চিরকাল আদরে আদরে বড় হয়েছে ওর কি এখন বিবেচনা করবার ক্ষমতা হয়েছে।"

দেবেনবাবু ভাভাব পত্নীর কথায় কোন উত্তর দিলেন না। উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে আকাশের পানে চাহিলেন। নীল আকাশ তারার মালা পরিয়া স্থির ধীর শান্ত। কৃষ্ণপক্ষের রজনীর গাঢ় অন্ধকার তাহার উপর নিলাম্বরী সাড়ী পরাইয়া দিয়াছে। সেখানে কোন চঞ্চলতা নাই,—প্রকৃতি যেন তথায় অনন্ত শান্তি ছড়াইয়া দিয়াছে। অজানিতভাবে একটা গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস দেবেনবাবুব নাসিকা পথে বাহির হইয়া আসিল,—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। পতির দীর্ঘশ্বাসে পত্নীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল,—কাত্যায়নী ব্যস্ত-ভাবে বলিলেন, "তুমি অমন করে আর শুধু শুধু কেন ভাবছ! তোমার আর ভাবতে হবে না, আমি যেমন করে পারি, পঙ্কীর সঙ্গেই নরেনের বিয়ে দেব।"

দেবেনবাবু আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু পঙ্ক-জিনীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তিনি নীরব হইলেন। পঙ্ক গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঠোঁট দুইখানি ফুলাইয়া মুখখানি বেশ একটু ভার করিয়া বলিল, "দেখুন না জ্যাঠামশাই, নরেন দা শুধু শুধু আমায় বকৃছে।"

দেবেনবাবু মুখ তুলিয়া পঙ্কজিনীর প্রতি চাহিলেন,—তিনি এমন করিয়া বহুদিন তাহাকে লক্ষ্য করেন নাই,—আজ তাঁহার

প্রথম চক্ষে পড়িল যে পঙ্কের সমস্ত দেহখানি কৈশরের পূর্ণবিকাশে ভরিয়া উঠিয়াছে। বর্ষার পূর্ব্বে স্রোতস্বতি যেমন এক মহিমাময়-রূপে সাগরের বক্ষে ঝাপাইয়া পড়িবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে, পঙ্কজিনীর সমস্ত দেহখানিও সেইভাবে যৌবনের আগমন বার্ত্তা সর্ব্বস্থানে অঙ্কিত করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি মনে মনে বলিলেন, "না আর দেরী করা কিছুতেই উচিত নয়। এক্ষণে যত শীঘ্র সম্ভব পঙ্কের বিবাহ দেওয়া আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। তাহার পর মৃদু হাসিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, "তুমি কিছু মনে করোনা মা,—আমি তাকে আজ খুব বকে দেব অখন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঙ্কজিনীর বিবাহ স্থির হইয়া গেল। যাহা হইবার তাহা হইবেই। নিয়তি রাণীর অকাট্য বিধান অখণ্ডনীয়। তাহার অন্যথা করে কাহার সাধ্য। মানুষতো ক্ষুদ্র স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও তাহারই বিধানে ব্যাধের শরে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ যখন পঙ্কজিনীকে কিছুতেই বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইল না, তখন বাধ্য হইয়া দেবেনবাবু পঙ্কজিনীর জন্য একটী সুপাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অর্থের আনুকুল্য থাকিলে কিছুরই অভাব হয় না। রাশিকৃত অর্থের বিনিময়ে শীঘ্রই এক সুপাত্র দেবেনবাবু পঙ্কজিনীর জন্য স্থির করিলেন। পাত্র মির্শিবপুরের জমীদারের একমাত্র পুত্র,—এইবার বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছে। পাত্রের রূপও যেমন, চরিত্রও তেমনি। যথা সময়ে পঙ্কজিনীর পাকা দেখাও সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের দিনও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রজনীর অন্ধকার চাঁদের আলোয় লুকোচুরি খেলিতেছিল। আকাশে তারা নাই,—নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ চন্দ্রমণ্ডল করিয়া ধরার গায়ে জ্যোৎস্না বৃষ্টি করিতে-ছিল। ফাল্গুনের মাতাল হাওয়া ফুলের গন্ধ হরণ করিয়া মাতালের মত ছুটিয়া আসিয়া গৃহের ভিতর, উন্মুক্ত ছাদে ঢলিয়া পড়িতেছিল। দেবেনবাবু তাহার শয়ন কক্ষে একাকী বসিয়া পঙ্কজিনীর বিবাহে

যাহা যাহা ব্যয় হইবে তাহারই একখানা ফর্দ্দ করিতেছিলেন। মাতৃ পিতৃহারা আত্মীয় বান্ধবহীনা বালিকার বিবাহে পাছে কোন ত্রুটী থাকিয়া যায়, সেই আশঙ্কায় পূর্ব্ব হইতেই বিবাহের যাহা যাহা প্রয়োজন বিশেষ ভাবে একে একে মনে করিয়া দেবেনবাবু তাহারই একটা, ফর্দ্দবন্দী করিতেছিলেন। বিবাহের উৎসবটা যাহাতে কোনরূপে হীণশ্রী না হয়, তিনি তাহারই জন্য পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতেছিলেন। তাঁহার একটা ইচ্ছা অসম্পূর্ণ হইয়াছে, পাছে আবার এ বিবাহও অঙ্গহীন হয় সেই আশঙ্কায় তিনি দুইহস্তে অর্থব্যয় করিতেছিলেন। দেবেনবাবু পঙ্কজিনীর বিবাহে যেরূপ আয়োজন করিতেছিলেন,—তাহাতে ব্যাপারটা যে নিতান্তই বাড়াবাড়ি হইয়া দাঁড়াইতেছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ বাড়াবাড়ি করা ব্যতীত তাঁহার উপায় ছিল না। তাঁহার বহুদিনের ইচ্ছাটায় বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি প্রাণে যে বেদনা পাইয়াছিলেন এই আনন্দ উৎসবের ভিতর সেইটাকে চাপা দেওয়া ব্যতীত তিনি শান্তি পাইতেছিলেন না। কিন্তু তথাপি সে বেদনাটা কিছুতেই যেন প্রাণের ভিতর ছাপা থাকিতে ছিল না। তিনি পঙ্কজিনীর জন্য যে পাত্র নির্ব্বাচিত করিয়াছেন,—রূপে, গুণে, ঐশ্বর্য্যে, চরিত্রে তাহার কোনটাই তাহাতে অভাব ছিল না, কিন্তু তথাপি তাঁহার যেন মনে হইতেছিল, এ বিবাহে পঙ্কোজিনী সুখী হইতে পারিবে না,—এ বিবাহে পঙ্কজিনীর সুখ নাই।

দেবেনবাবু ফুলশয্যায় কি কি কাপড় প্রয়োজন হইবে তখন তাহারই ফর্দ্দ তুলিতেছিলেন সেই সময় কাত্যায়নী আসিয়া

গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পত্নীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া দেবেনবাবু ফর্দ্দখানা বিছানার উপর রাখিয়া মুখ তুলিয়া পত্নীর দিকে চাহিলেন। কাত্যায়নী মুখখানা ভার করিয়া বলিলেন, "বলি হ্যাঁগা,—বিয়ে কি কারুর হয়নি, না বিয়ে কারুর হবে না। তোমার যে সব তাতেই বাড়াবাড়ি। দিনরাত্রি ফর্দ্দ আর ফর্দ্দ নিয়ে আছ। বলি নরুরও তো একটা বিয়ে দিতে হবে। এই সঙ্গেই একটা পাত্রী দেখলে হ'তো না। এক সঙ্গে দু'টো কাজই শেষ হয়ে যেত।"

দেবেনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নরুর বিয়ের পাত্রী দেখবার ভারতো আর আমার উপর নেই। আমার চখে পৃথিবীতে যে সব চেয়ে বড় সুন্দরী ছিল, আমি তারই সঙ্গে নরেনের বিয়ে দেব স্থির করেছিলেম, কিন্তু ছেলের তাও যখন পছন্দ হ'লো না তখন আমি কি করে তার পাত্রী ঠিক কর্ত্তে পারি বল? হয় ছেলে নিজে একটা দেখে শুনে পছন্দ করুক, না হয় তোমরা একটা দেখে শুনে দাও।"

স্বামীর কথাগুলা কাত্যায়নীর প্রাণের ভিতর খোঁচা মারিয়া অভিমানটাকে জাগাইয়া তুলিল। একটা পর অন্নপালিতা ভিখারী কালো মেয়েকে পুত্র বিবাহ করিতে না চাওয়ায় পুত্রের যে এমন বিশেষ কি অপরাধ হইয়াছে তাহা তিনি মোটেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। না বুঝিবার আরও একটা কারণ ছিল। ওই কালো মেয়েটির সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিতে মনে মনে তাহারও কোন দিন ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার একমাত্র পুত্র, তাঁহার চির-

দিনের আশা পুত্রের বিবাহ দিয়া কত সাধ আহ্লাদ করিবেন। পঙ্কজিনীর সহিত নরেন্দ্রের বিবাহ হইলে তাঁহার তো কোন আশাই মিটিতে পারে না। তিনি স্বরটাকে বেশ একটু অভিমান মাখাইয়া স্বামীর কথার উত্তর দিলেন, "এযে তোমার অন্যায় রাগ করা? আমাদেরই একটা চাকরের মেয়ে,—তার মা নেই, বাপ নেই, ঘর নেই দোর নেই, চাল নেই চুলো নেই তাকে নরু বিয়ে কর্ত্তে চায়নি এতে যে নরুর কি অপবাধ হয়েছে, তাতো বাপু বুঝতে পারিনি। সত্যি কথা বলতে কি, আমার এক ছেলে আমারও তো একটা সাধ আহ্লাদ আছে।"

পত্নীব কথাগুলা দেবেনবাবুর কর্ণে যেন লক্ষ করতালিব ঝনঝণার মত বাজিয়া উঠিল। তাহার গৌরবর্ণ মুখ একবাব মাত্র রাঙ্গা হইয়া পরক্ষণেই একেবারে সাদা হইয়া গেল। তিনি কিছুক্ষণ পত্নীব মুখের দিকে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীবে বলিলেন, "একটা চাকরের মেয়ে সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। কিন্তু সে এমন চাকর যার একটুখানি দয়ার ওপর তোমার স্বামীর জীবন এই পৃথিবীর ওপর জেগে ছিল,—যাব সেইটুকু দয়ার অভাব হ'লে আজ আর তুমি দেবেন দত্তের পত্নী হ'তে না। তোমার ছেলে নরেন হ'তো না। পৃথিবীতে যে যুগ পড়েছে তাতে আমার সে কথা ভুলে যাওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু কি করবো আমি তা ভুলতে পারিনি। কাজেই পঙ্ক আমার সব,—আমার সেই মহাপুরুষের শেষ স্মৃতি। থাক্ আমার কাজ আমি কচ্ছি, তোমাদের কাজ তোমরা কর, তাতে

তো আমি কোন দিনও তোমাদের বাধা দিইনি। নরেন পঙ্ককে বিয়ে কর্ত্তে চায়নি আমি তার অন্য পাত্র স্থির করেছি। এখন নরেন যাকে বিয়ে কর্ত্তে চায় তার সঙ্গে নরেনের বিয়ে দাও,—যত ইচ্ছে সাধ আহ্লাদ কর, আমার কোন আপত্তি নেই।"

কাত্যায়নীর স্বভাব ছিল কোমল,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাতৃস্নেহ ব্যতীত তাঁহার হৃদয়ে আর কিছুই স্থান পায় নাই। নরেনের ভাল বৌ হইবে, নরেন সুখে থাকিবে, জীবনে তাঁহার তাহাই একমাত্র চিন্তা ছিল। সেই স্থানটায় কোনরূপে একটু আঘাৎ লাগিলেই তাঁহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে যাতনায় অস্থির হইয়া উঠিত। তিনি একেবারে কোমর বাঁধিয়া স্বামীর সহিত তর্ক জুড়িয়া দিতেন; কিন্তু স্বামীর মুখের দুই তিনটা কথাতেই তাঁহার সমস্তই গুলাইয়া যাইত। স্বামী যাহা বলেন তাহাই ন্যায়, স্বামী যাহা করেন, তাহা কখনই অন্যায় নহে; এ বিশ্বাস কাত্যায়নীর সাবাল্য অটুট ছিল—এখনও আছে। কাজেই স্বামীর কথায় তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন গলিয়া গেল। তিনি মুখখানি ভার করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এওতো তোমারই অন্যায়। ছেলে যদি সত্যিই কিছু ভুল করে, তা সুধরে দেওয়া তোমারই তো উচিত। পঙ্কর সঙ্গে নরুর বিয়ে দেওয়াই যদি তুমি ভালো বিবেচনা করেছিলে, তাই কেন দিলে না। তুমি যদি জোর কর্ত্তে তা হ'লে নরুর সাধ্যি কি যে অন্যত করে।"

দেবেনবাবু মৃদু হাসিলেন; বলিলেন, "জোর ক'রে কখনও কোন কাজ পৃথিবীতে হ'তে পারে না। ভগবানের যা ইচ্ছে তা

চিরদিনই সম্পন্ন হয়ে আসছে,—চিরদিনই সম্পন্ন হবে। তবে আমার মতে যেটা ভাল, আমি সেটা বল্লুম, করা না করা সে তার ইচ্ছে। যে ভুল করবে তাকেই অনুতাপ কর্ত্তে হবে। এই ভগবানের রাজ্যের নিয়ম।"

স্বামীর সব কথার অর্থ কাত্যায়নী না বুঝিলেও এইটুকু বুঝিলেন যে, নিশ্চয়ই কোথাও একটা বড় রকমের অন্যায় হইতেছে, যাহা এখন আর সংশোধন করিবার উপায় নাই। তাহার প্রাণে ব্যথা লাগিল। তিনি স্বামীকে আর কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়ন পল্লব অশ্রু সিক্ত হইয়া আসিল। দেবেন বাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন, মৃদু স্বরে বলিলেন, এতে দুঃখ করবার তোমার কিছু নেই, জেনো সবই ভগবানের হাত। যাক্ নরেনের বিয়ের জন্যে তুমি ভেব না, পঙ্কর বিয়ের পরই আমি তোমার মনের মত একটী রাঙ্গা টুকটুকে বউ দেখে নরেনের বিয়ে দিয়ে দোব।"

স্বামীর শেষ কথাটায় কাত্যায়নীর আবার যেন ধড়ে প্রাণ আসিল। সহসা প্রাণে আঘাত লাগায় তিনি অনেক কথাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রাণটা ঠাণ্ডা হইবামাত্রই তাহার প্রথমেই মনে পড়িল এখনও দুগ্ধ জাল দিবার বাকী রহিয়াছে। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, বলিলেন, "তুমি যা ভাল বিবেচনা কর্ব্বে তাই হবে।"

কাত্যায়নী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দেবেনবাবু উঠিয়া বসিলেন। উন্মুক্ত গবাক্ষে তাহার দৃষ্টি পড়িল। গবাক্ষের

নিম্নেই রাজপথ, তখন লোকের ভিড়ে, গাড়ীর ঘড়ঘড়ে মুখোরিত হইয়া রহিয়াছে। লোক চলাচলের এক মুহূর্ত্তও বন্ধ নাই। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই যে যাহার কার্য্যে ছুটিয়াছে। কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। রাজপথের কোলাহলের দিকে চাহিয়া দেবেন বাবুর মনে হইতে লাগিল ;—সংসার পথও ঠিক এইরূপ কোলাহলে পরিপূর্ণ। যে যাহার নিজের লইয়াই চলিয়াছে, অন্যের দিকে ফিরিয়াও চায় না। অন্যের সুখ দুঃখ, অভাব অনুযোগ জানিবার কাহারও অবসর নাই,—নিজের টুকু কোনক্রমে বজায় থাকিলেই যথেষ্ট। দেবেনবাবুর মনটা একেবারে চিন্তার অসীম স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, সহসা পঙ্কজিনীর স্বর যেন সেই স্রোতের মুখটায় বাধা দিল। তাঁহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে সচকিত হইয়া উঠিল ;—তিনি মুখ ফিরাইলেন। দেবেনবাবুকে মুখ ফিরাইতে দেখিয়া পঙ্কজিনী তাহার সরল সুন্দর হাস্যে সমস্ত ঘরখানার বিষাদ দূর করিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিল, "জ্যাঠা মশাই, আপনি যে বড় এখানে একলাটি চুপ করে ব'সে আছেন? হ্যাঁ জ্যাঠামশাই আজ কাল আপনি কি এত ভাবেন?"

আজ কাল পঙ্কজিনীকে দেখিলে দেবেন বাবুর প্রাণটা যেন কাঁদিয়া উঠিত। যাহাকে চিরদিনের মত আপনার করিবার ইচ্ছা ছিল, সেই দুইদিন বাদে পর হইয়া যাইবে। যাহাকে চিরদিন কন্যার মত করিয়া নিজের কাছে কাছে রাখিবার সাধ ছিল, তাহাকে পরের ঘরে দূরে পাঠাইতে হইবে, ইহাতে কাহার প্রাণ না কাঁদিয়া উঠে। পঙ্কজিনীর মুখভরা হাসির দিকে চাহিয়া,

দেবেনবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা, দু'দিন বাদে তুমি পর হয়ে যাবে,—দু'দিন বাদে তুমি পরের ঘরে চলে যাবে,—সেই কথাই দিনরাত ভাবি। ভেবেছিলেম মা, তোমাকে আমার ঘরের-লক্ষ্মী করে, চিরদিন আমার সংসারের মাঝখানে বেঁধে রেখে দেব; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা তা নয়, কাজেই আমার সে সাধ পূর্ণ হ'লো না।"

দেবেনবাবু নীরব হইলেন,—তাহার প্রাণের ভিতর চিন্তার শত তরঙ্গ বহিতে লাগিল। দেবেনবাবুর অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া পঙ্কের মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল। সে বলিবার মত কোন কথাই খুঁজিয়া পাইল না। মুখখানি চুণ করিয়া নীরবে অবনত মস্তকে দাড়াইয়া বস্ত্রের অঞ্চলটা ধীরে ধীরে নাড়িতে লাগিল। গৃহের বৈদ্যুতিক আলো তাহার সমস্ত দেহটি বেষ্টন করিয়া তাহার রূপের মাধুর্য্য উজ্জ্বল করিতে লাগিল। দেবেনবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার আরম্ভ করিলেন, "শোন মা, আমি যতদূর সম্ভব খুঁজেপেতে একটা সৎপাত্রের হাতেই তোমায় তুলে দিচ্ছি—সুখী হওয়া না হওয়া সে ভগবানের হাত। কিন্তু যার ঘরে যাচ্ছ মা তার ঘরেরলক্ষ্মী হ'য়ে, তার সংসার উজ্জ্বল ক'রে তুলো। তুমি যার নাতনি, সেই সনাতনের মহিমাটা যেন চিরদিন তোমার আচরণে উজ্জ্বল হ'য়ে থাকে। শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী, দেবর এরাই হলেন সংসারে স্ত্রীলোকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মীয়। তাদের মধ্যে গিয়ে তাদেরে যেন চিরদিনের মত আপনার ক'রে নিও।"

পঙ্কজিনী কোন কথা কহিতে পারিল না। দেবেনবাবুর কথাগুলা তাহার মরমে প্রবেশ করিয়া, হৃদয়ের ভিতর যেন একটা ভক্তি সমুদ্র সৃষ্টি করিতেছিল। দেবেনবাবু আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পঙ্কজনীর মুখের দিকে ফিরিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা এ বিয়েতে তোমার মত আছে তো?"

পঙ্কজনী এতক্ষণে কথা কহিল, দেবেনবাবু যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে তাহার কোন উত্তর দিল না। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "জ্যাঠামশাই আপনাকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাক্‌বো। আপনার জন্যে আমার বড় মন কেমন কর্ব্বে।"

দেবেনবাবুর নয়নপল্লব ছল ছল করিয়া উঠিল,—তিনি অতি গাঢ় স্বরে বলিলেন, "কিন্তু আরতো তোমায় রাখতে পারিনি মা। প্রজাপতির পাখা নড়েছে, এখন তোমাকে তোমার স্বামীর ঘরে প্রতিষ্ঠা করাই আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। স্বামীই স্ত্রীলোকের পৃথিবীতে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা। তোমার দেব পূজার সময় উপস্থিত,—তার জন্যে তুমি মা প্রস্তুত হও।"

পঙ্কজিনী নীরব! সে আবেগ পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া চুপ করিয়া দেবেনবাবুর সম্মুখে দাড়াইয়া রহিল। তাহার অন্তরের ভিতর যে তরঙ্গ বহিতেছিল, সে ভাবিয়াছিল অবিচলিত ধৈর্য্যের দ্বারা সে তাহা প্রাণের ভিতরেই চাপিয়া রাখিবে,—কিন্তু আর বুঝি তাহা ঠেকাইয়া রাখা যায় না! সে প্রাণটাকে দৃঢ় করিবার জন্য তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিল। দেবেনবাবুও স্তব্ধ হইয়া নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে নিজেকে গভীরভাবে নিহিত

করিয়া বসিয়া রহিলেন। পঙ্কজিনী তাঁহার কন্যার চেয়েও প্রিয়,—তাঁহার স্নেহের অমূল্য উপাদান। আজ সেই পঙ্কজিনীর সহিত তাঁহার বাহ্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে;—ফলকে নিজের জীবনরসে পরিপক্ক করিয়া তুলিয়া এক্ষণে অপরের হস্তে তুলিয়া দিতে হইবে! ইহাই বিধাতার ইচ্ছা,—ইহাই ভগবানের অভিপ্রেত। দেবেনবাবু নীরবে তাহারই আয়োজন করিতেছিলেন। ঘড়ীতে দশটা বাজিয়া গেল। কাহার মুখে কথা নাই। সমস্ত ঘরখানা যেন একটা গাঢ় নীরবতার ভিতর ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আনন্দ কোলাহলের ভিতর দিয়া মিলন রাত্রি প্রভাত হইল। উষার ললাটে সিন্দুররেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ঘুমের কোল হইতে জাগিয়া উঠিয়া আবার কর্ম্ম কোলাহলে অঙ্গ মেলিয়া দিল। কাল পঙ্কজিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে,—আজ সে শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে। আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নরেন্দ্রনাথের প্রাণের ভিতর কোনরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতে তাহার প্রাণের ভিতর তুমুল ঝটিকা আরম্ভ হইয়াছে। সে ঝটিকায় তাহার অস্থি পঞ্জর চূর্ণ হইয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, শুধু একটা খেয়ালের বশে সে চিরদিনের মত নিজের প্রাণটাকে একেবারে হারাইয়া বসিয়াছে। সে এই প্রাণহীন দেহটাকে লইয়া কেমন করিয়া পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া থাকিবে। অনুতাপের একটা তীব্র গ্লানি তাহার মনের ভিতর তুষের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। তাহারই প্রচণ্ড উত্তাপে, তাহার সমস্ত দেহটা পুড়িয়া বুঝি একেবারে ছাই হইয়া যায়!

রাত্রে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের আহারের পর নরেন্দ্র চোরের ন্যায় আসিয়া তাহার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। রাত্রি কি ভাবে কখন চলিয়া গিয়াছে, তাহা তাহার খেয়াল নাই।

সে সেই যে আসিয়া একখানি চেয়ার লইয়া গবাক্ষের সম্মুখে বসিয়াছিল, এখনও ঠিক সেইভাবেই বসিয়া আছে। রজনীর পর উষা আসিয়াছিল সেও এক্ষণে সূর্য্যের আলোকে ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, নরেন্দ্রনাথের তাহাও খেয়াল নাই। সে গবাক্ষের উপর পা দুইটা তুলিয়া দিয়া স্তব্ধ হইয়া আকাশের পানে চাহিয়া ছিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত নরেন্দ্রের কেহ খোঁজ করে নাই, কিন্তু এইবার নরেন্দ্রের খোঁজ পড়িল। কন্যা বিদায়ের সময় উপস্থিত হইয়াছে,—সকলেই কন্যা ও নব জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন। দেবেনবাবু কন্যা ও জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়া সর্ব্ব প্রথম নরেনের খোঁজ করিলেন। গৃহে সমস্ত আত্মীয় স্বজন উপস্থিত কেবল নরেন নাই। দেবেনবাবু নরেনকে দেখিতে না পাইয়া পত্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"সকলকে দেখতে পাচ্ছি নরেনকে দেখতে পাচ্ছিনে কেন? নরেন গেল কোথায়,—ডাক তাকে,—সে পঙ্ককে আশীর্ব্বাদ কর্ব্বে না?"

কাল সমস্ত দিন রাত্রির ভিতর পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। স্বামীর কথায় কাত্যায়নীর পুত্রের জন্য প্রাণটাই চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তাওতো বটে। কনে জামাই আশীর্ব্বাদ হচ্ছে; নরু বোধ হয় খবর পাইনি, যাই আমি তাকে ডেকে আনিগে।"

কাত্যায়নী পুত্রের অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। এ ঘর সে ঘর ঘুরিয়া তিনি নরেন্দ্রনাথের শয়নগৃহে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি পুত্রের মুখেরদিকে চাহিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার মুখখানি একেবারে এইটুকু হইয়া গেল। এই একরাত্রের ভিতর নরেন্দ্রনাথের সমস্ত মুখখানার উপর যেন একটা কালির ছোপ ধরিয়া গিয়াছে। কাত্যায়নী মহা ব্যস্তভাবে পুত্রের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যারে নরু, তোর কি কোন অসুখ করেছে ?"

জননীর স্বরে নরেন্দ্রের যেন চমক ভাঙ্গিল,—তাহার মৃতদেহে যেন আবার একটু জীবনী শক্তি ফিরিয়া আসিল। জননীর কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে স্পষ্ট প্রবেশ করিল না। সে বিহ্বলের ন্যায় জননীর মুখেরদিকে চাহিতে লাগিল। কাত্যায়নী পুত্রের ভাব দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন। জননীর প্রাণ পুত্রের ভাবনায় সততই চঞ্চল হইয়া থাকে, তাহার উপর যদি একমাত্র পুত্র হয় তাহা হইলে তো আর কথাই নাই। তিনি তাড়াতাড়ি নরেন্দ্রের কপালে হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তাইতো বলি নরুকে দেখতে পাচ্ছিনে কেন ? তা অসুখ হয়েছে আমায় বলতে হয়। একটা বিলিব্যবস্থা তো কর্ত্তে হবে।"

এতক্ষণে জননীর কথাটা নরেন্দ্রের নিকট স্পষ্ট হইল। সে তাহার জননীর কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কই মা আমার তো কোন অসুখ হয়নি। কাল সমস্ত রাত্রি ঘুম হয়নি তাই শরীরটা তত ভাল নেই।"

পুত্রের কথায় কাত্যায়নী যেন একটু সুস্থির হইলেন; বলিলেন, "তাই ভালো আমি ভেবেছিলেম বুঝি কিছু অসুখ বিসুখ করেছে।

তা এখন চ' মেয়ে জামাই আশীর্ব্বাদ হচ্ছে,—পঙ্কীকে আশীর্ব্বাদ কর্ব্বিনি ?"

পঙ্কোজিনীর নামে নরেন্দ্রনাথের প্রাণটা স্পন্দিত হইয়া উঠিল, সে আমতা আমতা করিয়া বলিল, "আমি আবার আশীর্ব্বাদ কি কর্ব্বো মা ?"

কাত্যায়নী পুত্রের কথায় যেন অবাক হইয়া গেলেন, পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওমা ওকি কথা নক, তাওকি কখন হয়। পঙ্কী যে তোর ছোট বোন,—এ সময় তাকে আশীর্ব্বাদ না কল্লে হয়। উনিতো পঙ্কীকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে এসে সব আগেই তোর খোঁজ করলেন। এখন চ', ওঠ, আর দেরী করিস্‌নে।"

নরেন্দ্রনাথ জননীর কথায় আর কোন উত্তর দিল না,—ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইল। সে যে পঙ্কোজিনীকে এত ভালবাসিত,—তাহাতো সে একদিনের তরেও অনুভব করিতে পারে নাই,—পরের হস্তে তাহাকে তুলিয়া দিতে যে এত কষ্ট হইতে পারে, তাহা তো সে একদিনের জন্যও বুঝিতে পারে নাই। আবাল্য পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া সে তাহার প্রাণের প্রতি স্তরে স্তরে জড়িত হইয়া গিয়াছে, প্রাণের সহিত বিচ্ছেদ ব্যতীত তাহাকে পরিত্যাগ করা যে অসম্ভব আজ প্রথম নরেন্দ্রের দেহের প্রতি রক্তবিন্দুটুকু পর্য্যন্ত তাহা অনুভব করিতেছিল। সে কি বলিয়া পঙ্কজিনীকে আশীর্ব্বাদ করিবে, "স্বামী লইয়া সুখী হও।" এ কথা তো তাহার কণ্ঠ হইতে কিছুতেই বাহির হইবে না।

এ কথা কণ্ঠ হইতে বাহির করিতে হইলে তাহার শেষ নিশ্বাস সেই মুহূর্ত্তেই চিরদিনের মত অনন্তের সহিত মিশিয়া যাইবে! নরেন্দ্রনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাড়াইল বটে, কিন্তু পা দুইটা এক পদও অগ্রসর হইতে চাহিল না। পুত্রকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কাত্যায়নী আবার বলিলেন, "আবার দাড়ালি কেন? চ', তোর আজ হ'লো কি?"

হ'লো কি! এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিবারও উপায় নাই। পঙ্কজিনী নারায়ণ শিলার সম্মুখে অপরের গলায় মালা অর্পণ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সে চিরদিনের মত পরের হইয়া গিয়াছে। আর তাহাকে আপনার বলিবার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত নরেন্দ্রনাথের নাই। সে কথা মনে করিলে পর্য্যন্ত পাপ স্পর্শে—পঙ্কজিনীর নারীধর্ম্মে আঘাত লাগে। এখন যতই কষ্ট হউক, মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত তাহা প্রাণের ভিতর চাপিয়া রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় উপায় নাই। জননীর স্বরে নরেন্দ্রনাথ প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করিয়া, জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

* * * * * *

গৃহখানি আত্মীয় স্বজনে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—সেখানে আর তিল ধরিবার স্থান নাই। এই গৃহখানিই দেবেনবাবুর বাটীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড ঘর। মূল্যবান আসবাব পত্রে গৃহখানি সজ্জিত। প্রাচীর গাত্রে বড় বড় আয়না,—আয়নার উপরে বৈদ্যুতিক আলোর দুই ডাল তিন ডালওয়ালা বেলওয়ারী

দেওয়ালগিরী। গৃহের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড বেলওয়ারী ঝাড ঝুলিতেছে। ঘরের আগাগোড়া ফরাসপাতা,—সেই ফরাসের ঠিক মধ্যস্থলে জরির বিছানার উপর বর ও ক'নে আসীন। তাহার সম্মুখে একখানা রূপার রেকাবীতে ধান-দূর্ব্বা ও একটী ক্ষুদ্র রূপার বাটীতে চন্দন রহিয়াছে। সকলেই একে একে যাইয়া সেই রেকাবী হইতে ধান-দূর্ব্বা লইয়া বর-ক'নেকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

নরেন্দ্রনাথ জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই গৃহের ভিতর ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র পঙ্কজিনীর মলিন মুখখানির উপর তাহার সর্ব্ব প্রথম দৃষ্টি পড়িল। সে মুখখানি আজ যেন এক নিবিড় কালিমায় ভরিয়া গিয়াছে। তাহার সেই সুন্দর বড় বড় চোখ দুইটি হইতে থাকিয়া থাকিয়া অশ্রুজলের বড় বড় ফোটা গণ্ড বহিয়া ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িতেছে। নরেন্দ্রনাথ পঙ্কজিনীর হাসিভরা মুখই চিরকাল দেখিয়া আসিয়াছে, অশ্রু ভারাক্রান্ত এমন মলিন মুখ আর কোনদিন দেখে নাই। এই পূর্ণ গাম্ভীর্য্যের অশ্রুমাখা মুখখানি আজ নরেন্দ্রের দৃষ্টির সম্মুখে যেন একটা নূতন আলো জ্বালিয়া দিয়া পঙ্কজিনীর অন্তর নিহিত অপরূপ মাধুর্য্য তাহার চক্ষের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিল। নরেনের এক দূর সম্পর্কীয় জ্যাঠাইমা গৃহের এক পার্শ্বে দাড়াইয়াছিলেন,—তিনি নরেন্দ্রকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে নরেন, যা পঙ্কীকে আশীর্ব্বাদ করগে যা।"

"এই যে নরেন" শব্দটা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র পঙ্কজিনী

তাহার সেই অশ্রুভাবাক্রান্ত নয়নদ্বয় চকিতের ন্যায় একবার তুলিল। নরেন্দ্রনাথ সে চাহনি অনুভব করিলেন। সে চাহনির ভিতর যেন একটা তীব্র অভিমান শেল লুক্কায়িত ছিল। শক্তি শেলের মত সেটা একেবারে নরেন্দ্রের হৃদয়ের মাঝখানে সজোরে আসিয়া আঘাৎ করিল। নরেনন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সেই রেকাবী হইতে দুর্ব্বা ও ধান তুলিয়া লইয়া বর-ক'নের মস্তক স্পর্শ করিল। পঙ্কজিনী নরেন্দ্রের পদদ্বয়ের সম্মুখে মস্তক অবনত করিয়া তাহার পদধূলী গ্রহণ করিল। সে মস্তক নত করিবামাত্র এক ফোটা অশ্রু নরেনের ঠিক পায়ের উপর টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। সেই অশ্রুবিন্দু পদস্পর্শ করিবামাত্র নরেন্দ্রের মনে হইল যেন সেই স্থানটা পুড়িয়া একেবারে ছাই হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহের প্রতি শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিল। সে যে বর-ক'নেকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছে, সে কথা সে একেবারে বিস্মৃত হইল। মহা অপরাধীর মত তাহার সমস্ত প্রাণটা সেই ঘর হইতে পালাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল কিন্তু দেবেনবাবু তাহাকে ডাকিলেন; তাহারও নয়নে অশ্রু। তিনি অতি গাঢ় স্বরে বলিলেন, "নরেন একটু দাঁড়াও। কোলে ক'রে পঙ্ককে তুমিই গাড়ীতে তুলে দিয়ে এস।"

পিতার আহ্বান নরেন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। তাহাকে আবার ফিরিতে হইল। ফাঁসির হুকুম শুনিয়া হত্যাকারীর মুখখানা যেমন সাদা হইয়া যায়, পিতার আদেশ শুনিয়া তাহারও

মুখখানা সেইরূপ একেবারে রক্ত শূন্য হইয়া পাণ্ডুববর্ণ ধারণ করিল। সে গৃহের পার্শ্বস্থ প্রাচীর ধরিয়া কাট হইয়া দাড়াইয়া রহিল। একে একে সকলের আশীর্ব্বাদ শেষ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বর-ক'নে বিদায়ের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবেনবাবু অগ্রসর হইয়া জামাতাকে ধরিয়া তুলিলেন, এবং ইঙ্গিতে পুত্রকে পঙ্কজিনীকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইতে বলিলেন। নরেন্দ্র আসিয়া যখন পঙ্কজিনীকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইল তখন তাহার চক্ষের সম্মুখে জগতের সমস্ত আলো নিভিয়া গিয়াছিল। তাহার কর্ণের চতুঃপার্শ্বে তখন কেবল বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তিন মাস হইল পঙ্কজিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের পর পঙ্ক কেবলমাত্র দুইবার শ্বশুরালয় হইতে আসিয়াছিল। মাতৃ-পিতৃহীনা কন্যাকে তাহার শ্বশুর অধিক দিন দেবেনবাবুর বাটীতে রাখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, সে কেবলমাত্র কয়েকদিনের জন্য দেবেনবাবুর নিকটে থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ একবারও তাহার সহিত ভাল করিয়া পূর্ব্বের মত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে পারে নাই। কেমন একটা কিসের সঙ্কোচ পঙ্কজিনীর নিকট উপস্থিত হইবার পথে যেন কাটার বেড়া রোপন করিয়া একেবারে মস্ত বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছে। পঙ্কজিনী দুই বারই দেবেনবাবুর বাটীতে পদার্পণ করিয়াই সর্ব্ব প্রথমেই নরেন্দ্রের খোঁজ লইয়াছিল এবং তাহার চির হাসিমাখা মুখখানি লইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ছুটিয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু পঙ্কজিনীকে দেখিবামাত্র নরেন্দ্রের প্রাণের সমস্ত তার একেবারে বেসুরা বাজিয়া উঠিয়াছিল; বিভীষিকা দেখিলে সহসা মানুষের প্রাণের ভিতরটা যে ভাবে কাঁপিয়া উঠে, তাহারও প্রাণের ভিতরটা ঠিক সেই ভাবে দরদর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সে কিছুতেই পঙ্কজিনীর সম্মুখে নিজেকে খাড়া রাখিতে পারে নাই,—যা তা করিয়া পঙ্কজিনীর জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর দিয়া একটা বাজে অছিলা করিয়া অবিলম্বে

গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পঙ্কজিনীর বিবাহের পর হইতে নরেন্দ্রনাথের প্রাণের সুখ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে যে ব্যথা পাইয়াছে যদিও তাহা মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট বলে নাই, কিন্তু তাহা পঙ্কজিনীর নিকট অবিদিত ছিল না। তাহার নয়নের সে শূন্য দৃষ্টি পঙ্কজিনীর নিকট সব কথাই বলিয়া দিয়াছিল।

সন্ধ্যা বহুক্ষণ হইয়া গিয়াছে। সারি সারি রাশি রাশি সৌধ শিখর পরিবেষ্টিত কলিকাতা নগরীর রাজপথের গ্যাসালোকগুলি হেলিয়া দুলিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কলিকাতা মহা নগরীকে রজনীর কোল হইতে টানিয়া আনিয়া তাহার তিমির বসন খুলিয়া দিতেছিল। নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। শূন্য ঘর,—ঘরে জনপ্রাণী নাই। গৃহের আলো তখনও জ্বালা হয় নাই, ঘরখানা একেবারে অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ গাঢ় অন্ধকার গৃহে পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিল। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া অনেক খুঁজিয়া বহু কষ্টে প্রাচীর গাত্রস্থিত বৈদ্যুতিক আলোর সুইচটা বাহির করিল এবং সুইচ্ টিপিয়া আলোটা জ্বালিয়া দিল। আলোটা জ্বলিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানা যেন একেবারে অন্ধকারের ভিতর হইতে গা ঝাড়া দিয়া হাসিয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে যাইয়া সোফার উপর বসিয়া পড়িল। যেন একটা কিসের চিন্তায়,—যেন একটা কিসের বেদনায় তাহার সমস্ত মুখখানার উপর একটা কালির ছোপ ধরিয়া গিয়াছিল।

সে বেদনাটা, সে চিন্তাটা যে কিসের অনেকেই নরেন্দ্রনাথকে সে প্রশ্ন করিয়াছে,—সেও প্রাণের নিকট সে কথা বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনই সদুত্তর পায় নাই।

বাল্যকাল হইতেই সমস্ত জিনিষ এলোমেলো করা তাহার স্বভাবের একটা প্রধান দোষ ছিল। আলমারী কিম্বা সেল হইতে সে যাহা কিছু টানিয়া নামাইত, তাহা আর যথাস্থানে তুলিয়া রাখা তাহার দ্বারা কোন দিনই ঘটিয়া উঠে নাই। পঙ্কজিনী প্রত্যহ দুই তিনবার নরেন্দ্রের ঘরখানা গুছাইয়াও তবুও ঘরখানা গুছাইয়া উঠিতে পারিত না। সে আজ তিন মাস শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছে, আজ তিন মাস আর কেহ তাহার ঘরখানা একবারের জন্যও গুছায় নাই। ভৃত্য প্রাতে ও বৈকালে নাম মাত্র ঝাঁট দিয়া গিয়াছে। যে জিনিষটা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে, আজ পর্য্যন্ত সেখান হইতে তাহা এক ইঞ্চিও নড়ে নাই,—ঠিক সেইভাবেই পড়িয়া আছে। আলমারী হইতে এক একটা করিয়া সমস্ত জিনিষই প্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে ও বাহিরের অনেক আবর্জ্জনা আলমারীতে স্থান পাইয়াছে। এইরূপে ঘরখানা ঠিক যেন একটা পুরাতন জিনিষ বিক্রয়ের দোকানের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া, ঘরের অবস্থা দেখিয়া বিদ্যুতের মত আবার একবার পঙ্কজিনীর কথাটা নরেন্দ্রনাথের প্রাণের ভিতর চমকাইয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ ধনীর পুত্র,—তাহার গৃহে দাসদাসীর অভাব নাই,—সকলেই আছে, শুধু একটী বালিকার

অভাবে আজ তাহার গৃহের এই অবস্থা। কই দাস দাসীর শত মাজাঘসা সত্ত্বেও তো গৃহের অবস্থা ফিরে নাই। সেই ক্ষুদ্র নিপুণ হাতখানি না পড়িলে, গৃহের অবস্থা যে ভবিষ্যতে আর কখনও ফিরিবে তাহারও আশা অতি অল্প। নরেন্দ্রনাথ প্রাণের চিন্তার স্রোতটা অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য একখানা পুস্তক টানিয়া লইতেছিল, সেই সময় কাত্যায়নী আসিয়া ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া অতি মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ নরু তুই কখন বাড়ী ফিরলি। কই আমাকে ত ডাকিস্‌নি। এমন করে সন্ধ্যে বেলা চুপটি করে শুয়ে আছিস্ কেন? অসুখ বিসুখ করে নিতো? পঙ্কির বিয়ের পর থেকেই তুই মুখটি চুপ করে থাকিস্ কেন রে? পঙ্কির জন্যে বুঝি তোর মন কেমন করে?"

একটা ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস নরেন্দ্রনাথের প্রাণের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। প্রাণের ভিতর কত কথা, কত স্মৃতি প্রাণের দ্বারে আলোড়িত করিয়া হৃদয়ের ভিতরটা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। সে মায়ের কথার উত্তরে অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল, "অসুখ হবে কেন মা,—তুমি তো আমার সব সময়ই অসুখ দেখ। অনেকখানি হেটে এসেছি তাই একটু চুপ করে শুয়ে আছি, অসুখ বিসুখ হবে কেন?"

পুত্রের কথায় কাত্যায়নীর প্রাণের ভারটা একটু হাল্‌কা হইল। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভালো থাকলেই ভালো। শোন্ আমি তোকে একটা কথা বল্‌তে এলুম,—আজ ঘটক

ঠাকরুন এসেছিলেন। তোর জন্যে একটী মেয়ে ঠিক করছেন। মেয়েটি দেখতেও যেমন দেবে থোবেও তেমনি। তুই যেমনটি চাস্ ঠিক তেমনটি। আমি মেয়েটিকে দেখেছি,—তুই যদি দেখতে চাস্ তো বল আমি সব বন্দোবস্ত করি। যা কাল গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আয়।"

পঙ্কজিনীর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রাণটা একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছিল, এই শূন্য প্রাণ লইয়া পৃথিবীতে জীবন ধারণ করা তাহার ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। নরেন্দ্রনাথ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিল,—প্রাণের এ শূন্যতা অতি সত্বর না পূর্ণ করিতে পারিলে, তাহার মস্তক বিকৃত হইয়া যাইবে,—তাহাকে উন্মত্ত হইতে হইবে। জননী নীরব হইবামাত্র সে ধীরে ধীরে বলিল, "বেশ তো মা, তোমার যখন ইচ্ছে,—তোমার যখন পছন্দ হয়েছে তখন আমার কোন আপত্তি নেই। মেয়ে দেখবার আমার কোন দরকার নেই, তুমি দেখেছ তো তা হ'লেই হ'লো।"

নরেন্দ্রনাথ যে এত শীঘ্র বিবাহে সম্মতি দিবে কাত্যায়নী তাহা একবারও ভাবিতে পারে নাই। পুত্রের কথায় আনন্দে তাহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল,—হইবারই কথা। নরেন্দ্রনাথ তাঁহার একমাত্র পুত্র,—পুত্রের বিবাহ দিয়া মনের মত পুত্রবধূ গৃহে আনিবেন, ইহাতে কোন্ জননীর প্রাণ না আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পুত্রের কথায় আনন্দ কাত্যায়নীর মুখে চোখে উচ্ছ্লিয়া উঠিয়াছিল,—

তিনি হাসিয়া অতি স্নেহের স্বরে বলিলেন, "তা'হ'লে আমি যাই, সব ঠিক ঠাক ক'রে ফেলিগে। বিয়েটা এখন যত শিগ্‌গির হয় ততই ভালো। এত দিন পঙ্কী ছিল, সে সমস্ত বাড়ীময় দিনরাত হেসে খেলে বেড়াত, সে নেই কাজেই বাড়ীটা বড়ই ফাঁকা ফাঁকা হয়ে পড়েছে। তোর একটা বৌ ঘরে এনে যাহ'ক তাকে নেড়ে চেড়ে পঙ্কীর অভাবটা অনেকটা ভুলতে পারবো। যাই ওঁকে গিয়ে তা' হ'লে বলিগে যে, নরু বিয়ে কর্ত্তে রাজি হয়েছে। যেমন করে পারি কালই আমি ওঁকে ক'নে দেখ্‌তে পাঠাব। নে উঠে বোস, মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে। সেই কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছিলি, খিদে পেয়েছে বুঝি? যাই আমি তোর খাবারের বন্দোবস্ত করিগে।"

কাত্যায়িনী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, নরেন্দ্রনাথ সোফার উপর আবার কাৎ হইয়া পড়িল। জননী চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি চিন্তা যেন চারিপার্শ্ব হইতে ছুটিয়া আসিয়া, তাহার মাথাটা দখল করিয়া বসিল। একটু চিন্তার উনিশ-বিশের জন্য,—একটু ভুল করিয়া সে জীবনের সমস্ত সুখ হারাইতে বসিয়াছে, আবার জননীকে বিবাহে সম্মতি দিয়া আর এক ভুল করিল কিনা কে তাহার মীমাংসা করিবে। কিন্তু ভুল দিয়া ভুল ঢাকা ব্যতীত তাহার আর অন্য উপায় নাই,—সে আর কিছুতেই এরূপ ভাবগ্রস্ত জীবন বহন করিতে পারে না। হৃদয়ের সবটা স্থান জুড়িয়া পঙ্কজিনী বসিয়া ছিল, সে চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্থানটা একেবারে শূন্য হইয়া পড়িয়াছে যে,

ভাবেই হউক সে স্থানটা পূর্ণ করিতেই হইবে। সে স্থান পূর্ণ কর‍বার একমাত্র উপায় বিবাহ। বিবাহের কথা নরেন্দ্রনাথের মনের ভিতর যতই আলোড়িত হইতে লাগিল, ততই পঙ্কজিনীর মূর্ত্তিখানি যেন এক অপরূপ রূপে স্বর্গের জ্যোতিঃ ছড়াইয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। আজ পঙ্কজিনী পরস্ত্রী, ভগিনী জননীর সমান,—তাহার কথা চিন্তা করাও মহাপাপ,—চিন্তা করিলেও তাহার সতী-ধর্ম্মে আঘাত লাগে। নরেন্দ্রনাথ অস্থির হইয়া উঠিল। যেমন করিয়াই হউক পঙ্কজিনীর স্মৃতি প্রাণ হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে কিন্তু মুছিয়া ফেলিব বলিলেই যদি মুছিয়া ফেলা যাইত তাহা হইলে আর চিন্তার কিছুই থাকিত না। সে যতই ভাবিতে লাগিল পঙ্কজিনীর স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে হইবে অবাধ্য স্মৃতি ততই যেন প্রবল হইয়া তাহার চারিপার্শ্বে নৃত্য জুড়িয়া দিল। দুর্ব্বল মনের উপর নরেন্দ্রনাথের একেবারে ঘৃণা হইয়া গেল; সে গৃহ হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল সেই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু আপনাকে ডাকছেন।"

ভৃত্যকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি! বাবা আমায় ডাক্‌ছেন?"

ভৃত্য কেবলমাত্র বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

নরেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বলিল, "বল্‌গে যা, যে ছোটবাবু আস্‌ছে।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথের সমস্ত প্রাণটা যেন একে-

বারে দুলিয়া উঠিল। পিতা যে তাহাকে বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। পিতার কথার উত্তরে সে কি বলিবে, কি না বলিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ধরিত্রী পদ নিম্নে তাহার দুলিতে লাগিল। সে আবার ধীরে ধীরে সোফার উপর বসিয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এ বাজারে পুত্রের বিবাহে বিলম্ব হয় না, তাহার উপর যদি পুত্রের পিতার অর্থ থাকে। পুত্র যেমনই হউক কন্যার পিতা তাহা হইলে তাহার হস্তে কন্যাটিকে সমর্পণ করিতে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। কাজেই নরেন্দ্রনাথ বিবাহে সম্মতি দিবার পর এক সপ্তাহও অতিবাহিত হইল না, কলিকাতার এক বনেদী বড়লোকের রূপবান কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। পঞ্জিকার নির্দ্ধারিত মহা শুভলগ্নে লালিতাময়ী একরাশ রূপ লইয়া দেবেন্দ্রবাবুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাত্যায়িনী বরণ করিয়া নববধূকে গৃহে তুলিলেন। বধূর রূপের প্রভায় তাহার নয়ন ভরিয়া গেল, আনন্দে সমস্ত প্রাণটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পঙ্কজিনীর রং একটু কালো, পুত্র তাই তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল। লাল টুকটুকে বৌ বিবাহ করিতে পুত্রের সাধ, সে সাধ যে তিনি তাহার পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন ইহা অপেক্ষা তাহার আর অধিক কি আনন্দ হইতে পারে!

রাত্র ও দিন, আলো ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখের ভিতর দিয়া পৃথিবী সতত ঘুরিতেছে। এক দিকে যখন আলোর বিকাশ হয় অন্য দিকে তখন মসী অন্ধকার ঘনাইয়া উঠে। প্রকৃতির ইহাই নিয়ম,—বিধাতার ইচ্ছাও বুঝি তাই। নরেন্দ্রনাথের জীবনাকাশে যখন লালিতাময়ীর উদয় হইতে ছিল,—যখন আশার আলোয়

তাহার সমস্ত প্রাণ অরুণরাগ রেখার মত পরিষ্কার হইয়া উঠিতে ছিল, তখন পঙ্কজিনীর জীবনাকাশে সুখসূর্য্য অস্তমিত হইয়া নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার সূচনা হইতেছিল। নরেন্দ্রনাথের বৌভাতের আনন্দ যখন গান বাজনা ও প্রীতিভোজের ধূমে মুখরিত হইয়া উঠিয়া ছিল, সেই সময় দেবেনবাবু পঙ্কজিনীর শ্বশুরালয় হইতে এক 'তার' পাইলেন, "পঙ্কের স্বামী সহসা কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। রোগ মারাত্মক। অবিলম্বে পঙ্কজিনীকে যেন পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হয়।"

'তার' পড়িয়া দেবেনবাবু একেবারে বসিয়া পড়িলেন। পুত্রের বিবাহের সমস্ত আনন্দ নিমিষে যেন একটা নিরানন্দের আবরণে ছাইয়া ফেলিল। রোগ সাংঘাতিক,—এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবার উপায় নাই, যে কোন উপায়েই হউক পঙ্কজিনীকে তখনই শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে হইবে। তিনি একটা গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতলের সজ্জিত ফুল কামরার ভিতর বসিয়া পঙ্কজিনী নববধূকে মনের মত করিয়া ফুল-শয্যার সাজে সজ্জিত করিতেছিল। নরেন্দ্রনাথের বিবাহের আনন্দের ভিতর সে এ কয়দিন নিজেকে একেবারে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার নরেনদার বিবাহ,—নরেনদা সুখী হইবে, নরেনদার মনের মত টুকটুকে বৌ আসিয়াছে, এ আনন্দ তাহার রাখিবার স্থান নাই। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় সে আনন্দের তরঙ্গে একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার বিবাহের পর, সে আর নরেনদার মুখে একদিনের জন্যও হাসি দেখিতে পায়

নাই, সেই নরেনদার মুখে আবার হাসি ফুটিবে, ইহাতেই সে একেবারে বিভোর হইয়া গিয়াছিল। জগতের সমস্ত দুঃখ বেদনা আজ তাহার নিকট হইতে দূরে,—বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। সে এক মনে নববধূকে সাজাইতে ছিল. সহসা দেবেনবাবুর গৃহ প্রবেশের শব্দে, সে মুখ তুলিয়া চাহিল। দেবেনবাবুর সমস্ত মুখখানার উপর চিন্তা রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ম্লান বিশুষ্ক মুখের দিকে চাহিবামাত্র পঙ্কজিনীর যেন একটা অজানিত আশঙ্কায় সমস্ত বুকটা দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে ভীতা হরিণীর ন্যায় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেবেনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যাটামশাই আপনার মুখ এত শুক্‌নো কেন? অসুখ করেছে বুঝি?"

দেবেনবাবু পঙ্কজিনার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তিনি যে দুঃসংবাদ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা মুখ হইতে বাহির করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল। নরেন্দ্রনাথের বিবাহের আনন্দে পঙ্কজিনী জগৎ সংসার ভুলিয়া রহিয়াছে, এ সময় সেই দুঃসংবাদ তিনি কেমন করিয়া তাহাকে প্রদান করিবেন? কিন্তু সংবাদ না দিলেও নয়;—রোগ কঠিন না হইলে এমন দিনে পঙ্কজিনীর শ্বশুর কখনই তাঁহাকে 'তার' করিতেন না। দেবেনবাবু নিজেকে একটু দৃঢ় করিয়া কোনক্রমে বলিয়া ফেলিলেন, "মা বড় খারাপ খবর পেলুম। তোমাকে এখনি শ্বশুর-বাড়ী যেতে হবে। বাবাজির নাকি হঠাৎ কলেরা হয়েছে। তোমার শ্বশুর মশাই তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য আমায় 'তার' করেছেন।"

সহসা ভূমিকম্পে ঘর বাড়ী সমস্ত নড়িয়া উঠিলে, মানুষ যেমন একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়ে, দেবেনবাবুর কথায় পঙ্কজিনীরও কতকটা সেই ভাব হইল। তাহার হাস্যোৎফুল্ল মুখখানি নিমিষে একেবারে ম্লান হইয়া পড়িল। তাহার এত আনন্দ,—এত উৎসাহ যেন সহসা কর্পূরের মত উবিয়া গেল। সে পলকশূন্য নয়নে দেবেনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। দেবেনবাবু একটুখানি নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "মা রোগটা বড় খারাপ। আর দেরী করা কিছুতেই যেতে পারে না। তুমি যাবার জন্যে প্রস্তুত হও,—গাড়ীরও আব বেশী দেরী নেই। বাবাজির এমন সাংঘাতিক ব্যায়রামেব সংবাদ পেয়ে আমিও তো মা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকৃতে পারিনি। আমিই তোমায় সঙ্গে নিয়ে যাব।"

দেবেনবাবু আর উত্তরের অপেক্ষা করিলেন না। কথাটা শেষ করিয়াই যাত্রাব বন্দোবস্ত করিবার জন্য তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। পঙ্কজিনীর সমস্ত শক্তি ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, সে একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

পঙ্কজিনীর স্বামীর কঠিন পীড়ার সংবাদ অচিরে সমস্ত বিবাহ বাড়ীময় রাষ্ট হইয়া পড়িল। নরেন্দ্রনাথও সে কথা শুনিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহের সমস্ত কল যেন একেবারে বিকল হইয়া গেল। সে আজ ফুলশয্যায় নূতন আনন্দে ভাসিতে যাইতেছে, আর পঙ্কজিনী শোকের বোঝা মাথাই তুলিয়া লইবার জন্য স্বামীর মৃত্যু

শয্যায় ছুটিয়াছে। সে জীবন-সঙ্গিনী লাভ করিতেছে, আর পঙ্ক জীবন-সঙ্গ হারাইতে চলিয়াছে। বিধির একি বিচিত্র লীলা! পঙ্কজিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার যেন আজ কেমন সাহস হইল না। সে ভয়ে ভয়ে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

যাইবার সময় পঙ্ককে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া দেবেনবাবু নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পিতার আহ্বান সংবাদ পাইয়া নরেন্দ্রনাথ চোরের ন্যায় বিবর্ণ মুখে গাড়ীর দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পঙ্কজিনী তখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে, তাহার দৃষ্টি পঙ্কের স্তব্ধ ম্লান মুখখানির উপর পতিত হইল। সেই শ্যামবর্ণ ম্লান মুখখানির ভিতর নরেন্দ্রনাথ আজ যে এক নূতন সৌন্দর্য্য দেখিল, তাহা লালিত্যময়ীর গৌরবর্ণ মুখে নাই। সে রূপ যেন স্বর্গের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া চারিদিকে এক নব দীপ্তি ছড়াইয়া দিতেছে। নরেন্দ্রনাথ বিহ্বলভাবে সেই মুখের দিকে চাহিয়াছিল, পিতার স্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল;—সে পিতার মুখের দিকে চাহিল। দেবেনবাবু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "বাবাজির শক্ত ব্যায়রাম, কাজেই আমায় পঙ্ককে নিয়ে যেতে হচ্ছে, তোমার বিবাহ উপলক্ষে বাড়ীতে অনেক আত্মীয় কুটুম্ব এসেছে, দেখ যেন তাঁদের কোন আদর যত্নের ক্রটী না হয়। আমার সেখানে বিলম্ব হবার কোন কারণ নেই, বাবাজিকে একটু ভালো দেখেই আমি চলে আসবো। যে ক'দিন না আসি সংসারের সমস্ত ভার তোমার ওপর। তুমি আমার উপযুক্ত ছেলে, দেখ যেন আমার মর্য্যাদা নষ্ট না হয়।"

নরেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিল না। দেবেনবাবু কোচম্যানকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন, গাড়ী ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। গাড়ী চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রাণের সমস্ত আলো, কে যেন ফুৎকার দিয়া নিবাইয়া দিল,—চিন্তা রাক্ষসী যেন একটা আতঙ্কের পোষাক পরিয়া তাহার কর্ণে শত কুকথা গাহিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের কেবলই মনে হইতে লাগিল, পঙ্ক তাহার জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মচারিণী সাজিতে চলিয়া গেল। তাহার মলিন মুখখানি আর কোন দিন হাস্য রেখায় রঞ্জিত হইবে না,—তাহা চির দিনের মত মলিন হইয়া রহিবে। তাহার ফুলশয্যার প্রীতিভোজ সমস্তই যেন চক্ষের সম্মুখে একেবারে একেকার হইয়া গেল। সে একটা গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া টলিতে টলিতে আসিয়া বৈঠকখানা গৃহের ফরাশের উপর বসিয়া পড়িল। দেবেন-বাবু পঙ্ককে লইয়া চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-বাটীর সমস্ত আনন্দ-কোলাহল যেন একটা অজানিত নিরানন্দের ভিতর ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। দেবেন বাবু নাই,—নরেন্দ্রনাথ থাকিয়াও না থাকিবার মত, কাজেই সমস্তই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রণ উপলক্ষে যাঁহারা আসিয়াছিলেন,—তাঁহাদের অদ্ধেকের আহার হইল অদ্ধেকের হইল না। দুঃসংবাদটা যাহাদের কর্ণে পৌছিয়াছিল তাঁহারা দুঃখীত হইয়া, দুইবার 'আহা' বলিয়া গৃহে ফিরিলেন,—যাহাদের কর্ণে পৌছায় নাই তাহারা মহা বিরক্ত হইয়া 'এমন নিমন্ত্রণে আবশ্যক কি' প্রভৃতি বলিতে বলিতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ সেই যে

বৈঠকখানা গৃহে আসিয়া ফরাশের উপর বসিয়া পড়িয়াছিল,—তাহার পর কত লোক আসিয়া কত কথা বলিয়া গেল, তথাপি সে একবারের জন্যও গৃহ হইতে বাহির হয় নাই। সে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সেই ফরাশের উপর পড়িয়া গবাক্ষের দিকে চাহিয়াছিল। গবাক্ষের ভিতর দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছে! কৃষ্ণাকাশ তারার মালা পরিয়া হাসিতেছে। মাঝে মাঝে সে মালা হইতে এক একটা তারা খসিয়া পড়িয়া পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসিতে আসিতে অদ্ধ পথেই লুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। নরেন্দ্রনাথ সেই কৃষ্ণাকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন। কাত্যায়নী আসিয়া অতি স্নেহের স্বরে বলিলেন,—"আয়রে নরু রাত ঢের হ'য়েছে,—ছেলে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ছে, ফুলশয্যে করবি আয়।"

নরেন্দ্রনাথ একবার মাত্র জননীর মুখের দিকে চাহিল, কোন কথা কহিল না। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সে তাহার শয়ন কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইল। সে কক্ষ আজ যেন একটা নূতন ভাব ধারণ করিয়াছে। নূতন পালঙ্কে, নূতন বিছানা,—চারিদিকে যেন নূতনের একটা ছড়াছড়ি চলিয়াছে। এই নূতনের ভিতর আর এক নূতন সামগ্রী, কয়েকজন ললনা পরিবেষ্টিত হইয়া, মেজের উপর একখানা মকমলের কারপেটে উপবিষ্ট। নরেন্দ্রনাথকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া, একটী অর্দ্ধ প্রৌঢ়া রমণী তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "এই যে নরু এসেছে।"

প্রৌঢ়াটি নরেন্দ্রের সম্পর্কে দিদিমা হন. তিনি তাহার সম্মুখস্থ

একজন ললনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দে দেখি ফুলশয্যের কাপড়খানা।"

দিদিমার আদেশ পাইয়া,—সেই ললনা ফুলশয্যার কাপড়খানা তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। তিনি সেখানা নরেন্দ্রনাথের হস্তে দিয়া বলিলেন, "নে, এই কাপড়খানা ছেড়ে ক'নের পাশে গিয়ে বস্‌গে যা।"

নরেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিল না,—দিদিমার হস্ত হইতে কাপড়খানা গ্রহণ করিয়া গৃহের একপার্শ্বে যাইয়া কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিল। তাহার পর ধীরে ধীরে যাইয়া সেই মকমল কারপেটের উপর ক'নের পার্শ্বে যাইয়া উপবিষ্ট হইল। হাসি আনন্দ ও গণ্ডগোলের ভিতর দিয়া পনোর মিনিটের মধ্যেই ফুলশয্যার নিয়মগুলি সম্পন্ন হইয়া গেল। নূতন পালঙ্কে—নূতন বিছানা রাজ হংসের পালকের মত ধবধব করিতে ছিল। তাহাতে ছিন্ন ফুলের ছড়াছড়ি,—সেই ফুলের সুবাসে সমস্ত গৃহ আমোদিত। কয়েকজন ললনা নববধূকে সেই বিছানার উপর শয়ন করাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। সেই প্রৌঢ়া দিদিমাটি নরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এইবার ভাই তোমার জিনিষ তুমি বুঝে নাও,—আমরা এখন চল্লুম। নাতবৌয়ের রূপের জৌলসে দেখ যেন ভাই ঝল্‌সে যেও না।"

নরেন্দ্রনাথ দিদিমার দিকে একবার মাত্র চক্ষু তুলিয়া আবার মস্তক ধীরে ধীরে নত করিল। দিদিমা আর কোন কথা না বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। গৃহ হইতে বাহির হইয়া তিনি

গৃহের দরজাটা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। দরজা বন্ধের শব্দে নরেন্দ্রনাথ দরজার দিকে চাহিল। দরজার শিকল যে বাহির হইতে পড়িল তাহার শব্দটুকুও তাহার কর্ণে আসিল। সে একবার গৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, গৃহের মধ্যস্থলের প্রকাণ্ড ঝাড়ে বিদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে,—সেই আলোয় সমস্ত ঘরখানা একেবারে জ্বলজ্বল করিতেছে,—সেই আলোর নিম্নে পালঙ্কের উপর, ছিন্নফুলের শয্যার উপর ফুলসাজে সজ্জিত লালিত্যময়ী শায়িত, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত। সেই বস্ত্রাচ্ছাদিত মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র আবার পঙ্কজিনীর কথা যেন বিদ্যুতের মত নরেন্দ্রনাথের অন্ধকার হৃদয়াকাশে চকমক করিয়া উঠিল। তাহার মুখের একটা কথায় যেখানে পঙ্কজিনী শুইতে পারিত, সেখানে আজ তাহার এক সম্পূর্ণ অপরিচিত অজানা বালিকা আসিয়া শয়ন করিয়াছে। সে কেমন,—সে কি তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে পারিবে? কে যেন নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ের ভিতর অতি কঠোর স্বরে বলিয়া উঠিল, "না—না—না। হীরকের স্থান কি কাচখণ্ডে কোন দিন পূর্ণ হইয়াছে।"

একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, চিন্তার বোঝাটাকে দেহ হইতে নামাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া, নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ধীরে ধীরে পালঙ্কের উপর উঠিয়া লালিত্যময়ীর পার্শ্বে যাইয়া শয়ন করিল। সে বহুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া নিদ্রা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—কিন্তু নিদ্রা চক্ষে আসিল না। চিন্তাদেবী যেন ষড়যন্ত্র করিয়া, বিজিত সেনার

কেল্লা দখলের ন্যায় তাহার মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিয়া, নিদ্রার শান্তি ও আরাম হইতে তাহাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। নরেন্দ্রনাথ চিন্তার স্রোতের মুখে একটা বাধা দিবার জন্য নববধূর দিকে পাশ ফিরিল,—তাহার পর ধীরে ধীরে মাথাটা একটু তুলিয়া,—বধূর মুখের নিকট মুখটা আনিয়া, অতি সোহাগ ভরে তাহার হাতখান ধরিল। সে অতি মৃদুস্বরে বধূকে একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে ছিল, সেই সময় লালিত্যময়ী তাহার হাতখানা মহা বিরক্ত ভাবে টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "বাবারে, কি জ্বালাতন! একটু ঘুমুবারও জো নেই।"

নরেন্দ্রনাথ বধূর ভাব বুঝিতে পারিল না,—আবার মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি বড্ড ঘুম পেয়েছে?"

কোন উত্তর নাই। বধূ যে ভাবে শুইয়াছিল ঠিক সেইভাবেই শুইয়া রহিল,—নরেন্দ্রনাথের কথাটা যে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে এমন কোন লক্ষণই দৃষ্ট হইল না। সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অতি মৃদু স্বরে নানা ভাবে কথাটা দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু বধূর মুখ হইতে কোনই উত্তর পাইল না। সে কেবল একটু নড়িয়া, সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রটা আর একটু ভালো করিয়া জড়াইয়া পাশ বালিসটা টানিয়া, জুত করিয়া শুইল। বালিকা লজ্জায় উত্তর দিতে সংকোচ বোধ করিতেছে ভাবিয়া নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে তাহার অবগুণ্ঠনটা সরাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে নববধূ যেন ফনিণীর মত ফোঁস করিয়া উঠিল। লালিত্যময়ী একটা বিরক্তিপূর্ণ কটাক্ষে নরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া, মুখখানা বিকৃত

করিয়া উত্তর দিল, "না ঘুম পাবে কেন। জ্বালাতন,—কাণের গোড়ায় শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর—বাবারে কি জ্বালায়ই পড়েছি!"

বধূর মুখ চোখের ভাবে,—কণ্ঠের স্বরে, নরেন্দ্রনাথ একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। সে কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল। চিন্তার আগুন তখন তাহার প্রাণের ভিতর হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই আগুণে তাহার সমস্ত হৃদয়টা যেন একেবারে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল জগতে একটুও শান্তি নাই,—সমস্ত জগৎ জুড়িয়া কেবলই অশান্তির ঢেউ বহিতেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, অতি প্রত্যুষে দেবেনবাবু পঙ্কজিনীকে লইয়া ট্রেন হইতে অবতীর্ণ হইলেন। সারা-রাত্রি নিদ্রা না হওয়ায় তাহার চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইয়া ছিল,—মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে ছিল। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস মাথায় লাগায়, নিদ্রায় তাঁহার চক্ষু জড়াইয়া আসিতে লাগিল। তিনি দুই হস্তে চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া নিদ্রার হস্ত হইতে নিজেকে একটু চাঙ্গা করিয়া লইয়া,—পঙ্কের হাত ধরিয়া প্লাটফরম্ হইতে বাহিরে আসিলেন। ষ্টেশন হইতে পঙ্কজিনীর শ্বশুরালয় মিশিরপুর প্রায় দেড় ক্রোশ পথ। কিন্তু গমনাগমনের বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। ষ্টেশন হইতে বরাবর পাকা রাস্তা আছে। ঘোড়ার গাড়ী ও পাল্কী সর্ব্বদাই ষ্টেশনে পাওয়া যায়। দেবেনবাবু প্লাটফরম হইতে বাহির হইয়া একখানা ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ী গন্তব্য পথে ছুটিল।

পল্লী-জননীর উদার বক্ষে ঊষার প্রথম আলো, শিশুর হাসিটির মত ফুটিয়া উঠিতে ছিল,—নিস্তব্ধ নীরব পল্লীর শান্তিকুঞ্জের ভিতর হইতে পাখীর কাকলী মধুর বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। শস্য শ্যামল প্রান্তরের মধ্য দিয়া পাকা রাস্তা,—সেই রাস্তার উপর

দিয়া গাড়ী ছুটিয়াছে। দেবেনবাবু নীরবে গাড়ীতে বসিয়া ছিলেন। পল্লী-জননীর শত শোভা,—উষার মনোহর মূর্ত্তি কিছুই তাঁহার চক্ষে পতিত হইতে ছিল না। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে কেমন যেন একটা অমঙ্গল ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য করিয়া একটা ঝাপসার আবরণে জগতের সমস্ত আলো ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। পঙ্কজিনাও নীরব, তাহার সমস্ত দেহটা যেন একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছিল। বিশ্ব-প্রকৃতি, আকাশ, বাতাস সমস্তই আজ যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে ওলোট পালট হইয়া, বিরাট শূন্যের ভিতর ডুবিয়া যাইতেছিল। দেবেনবাবু একবার পঙ্কের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার ম্লান শুষ্ক মুখখানির দিকে চাহিবামাত্র, তাঁহার সমস্ত বুকটা যেন কেমন আনচান করিয়া উঠিল। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। গাড়ী প্রায় এক ঘণ্টা কাল ছুটিয়া পঙ্কজিনীর শ্বশুরালয়ের সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী দরজার সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র, অন্তঃপুরের ভিতর হইতে একটা মর্ম্মভেদী আকুল ক্রন্দন উত্থিত হইয়া, একটা শোকের কালিমা যেন চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। দরজার সম্মুখে বৃদ্ধ নায়েব মহাশয় দাঁড়াইয়াছিলেন, গাড়ীতে পঙ্কজিনীকে দেখিয়া বৃদ্ধের দুই চক্ষু অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া উঠিল, তিনি কাপড়ের খুঁটে চক্ষু মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে তথা হইতে সরিয়া গেলেন। দেবেনবাবু গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়াছিলেন, ব্যাপার বুঝিতে তাহার আর বিলম্ব হইল না। পা দুইটা তাহার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, সে দুইটা আর যেন তাঁহার দেহের ভার বহন

করিতে অসমর্থ হইল। তিনি আর একটু হইলেই ভূপতিত হইতেন,—তাড়াতাড়ি দরজাটা ধরিয়া ফেলিলেন। ক্রন্দনের স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে পঙ্কজিনী গাড়ীর ভিতর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, কয়েকজন ললনা আসিয়া ধরাধরি করিয়া তাহার মূর্চ্ছিত দেহ অন্তঃপুরের মধ্যে লইয়া গেল। দেবেন-বাবু পলকশূন্য নয়নে কাট হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বৃদ্ধ নায়েব মহাশয়ের স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন তাঁহার হৃদয়ের সবখানি ব্যথা বাহিরে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল, তিনি ফ্যালফ্যাল করিয়া নায়েব মহাশয়ের দিকে চাহিতে লাগিলেন, ভাল মন্দ কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। নায়েব মহাশয় অতি করুণ স্বরে বলিলেন, "চলুন, বৈঠকখানায় বসবেন চলুন।"

দেবেনবাবু নায়েব মহাশয়ের কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠ শুখাইয়া কাট হইয়া গিয়াছিল। তিনি বড় সাধ করিয়া, অনেক দেখিয়া শুনিয়া পঙ্কের বিবাহ দিয়া ছিলেন, তাঁহার বড় আশা ছিল পঙ্ক সুখে থাকিবে, কিন্তু বিধাতা বাধ সাধিলেন। এত খোঁজাখুঁজি, এত দেখা শোনা, এক লহমায় সব শেষ হইয়া গেল। পঙ্কজিনীর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা সহসা তাঁহার মনে উদয় হওয়ায় তাঁহার সমস্ত দেহটা যেন ঝিমঝিম করিতে লাগিল। তিনি কোন ক্রমে নায়েব মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে যাইয়া বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দাঁড়াইবার আর মোটেই ক্ষমতা ছিল না, গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া

ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ফরাশের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

* * * *

যে যায়—সেই কেবল চিরদিনের মত চলিয়া যায়। পৃথিবী তাহার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহে না। পৃথিবী পূর্ব্বেও যে ভাবে চলিতেছিল পরেও ঠিক সেইভাবেই চলিতে থাকে,—তাহার কার্য্যের একটুও উনিশ-বিশ হয় না। আজ ঠিক তিন দিন হইল পঙ্কজিনী বিধবা হইয়াছে,—আজ তিন দিন দেবেনবাবু তাহার শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন,—কিন্তু আর তিনি এখানে কিছুতেই অপেক্ষা করিতে পারেন না। পুত্রের বিবাহের ফুল-শয্যার রাত্রে তিনি চলিয়া আসিয়াছেন, সেখানে কি হইতেছে না হইতেছে তাহার কিছুই সংবাদ পান নাই; কলিকাতায় ফিরিবার জন্য তাহার সমস্ত প্রাণটা তাই একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পূর্ব্বেই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেন, কিন্তু পঙ্কজিনীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিবেন ভাবিয়াই এ কয় দিন তাঁহাকে এখানে অপেক্ষা করিতে হইয়া ছিল। পঙ্কজিনীর শ্বশুর একমাত্র পুত্র হারাইয়া একরূপ পাগলের মত হইয়াছিলেন, তিনি এ কয়দিনের ভিতর এমন একটুও অবসর পান নাই যে, তাঁহার মনের উদ্দেশ্যটা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন। অথচ পঙ্কজিনীকে ফেলিয়াও যাইতে পারেন না। শ্বশুরালয়ের সহিত যখন তাহার সমস্ত সম্পর্ক উঠিয়া গেল,—তখন আর সে এখানে কি করিতে থাকিবে! অতি প্রত্যুষে উঠিয়া দেবেনবাবু সেই সকল কথাই

চিন্তা করিতেছিলেন,—কথাটা এক্ষণে কি ভাবে পঙ্কজিনীর শ্বশুরের নিকট ব্যক্ত করিবেন সেইটেই মনে মনে স্থির করিতেছিলেন,—সেই সময় পঙ্কজিনীর শ্বশুর অভয়বাবু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। অভয়বাবুর বয়স পঞ্চাশ হইয়াছে,—চুল, গোঁপ সকলই পাকা,—দেহের গড়নটী বেশ সুন্দর। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলে প্রাণে একটু ভক্তির সঞ্চার হয়। পুত্র শোকের নিবিড় কালিমায় আজ তাঁহার মুখখানি একেবারে ঢাকা। তিনি ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেবেনবাবুর সম্মুখে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। দেবেনবাবু অভয়বাবুর সেই ম্লান গম্ভীর মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না,—নীরবে অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। অভয়বাবুই প্রথম কথা কহিলেন; তিনি দেবেনবাবুর সম্মুখে বসিয়া নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া দেবেনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার বোধ হয় এ ক'দিন অনেক অসুবিধে হ'য়েছে,—আমি নিজে কিছুই দেখ্‌তে পারিনি, দেখবার আমার ক্ষমতাও ছিল না।"

দেবেনবাবু তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "না—না, অসুবিধে কি;—অসুবিধে কিছুই হয়নি। সে জন্যে আপনি একেবারেই ব্যস্ত হবেন না,—আমি তো আপনার পর নই।"

অভয়বাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "শিশির আমার বুকটা একেবারে ভেঙ্গে দিয়ে চ'লে গেছে। আমার যা সর্ব্বনাশ হবার তা তো হয়েছেই কিন্তু আমার বোমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো সেই কথাই আমি দিন রাত্তির ভাবছি। মা যে আমার কত

ভালো তা মুখে বলা যায় না। আমি তো তার এমন কোন অপরাধই দেখ্‌তে পায়নি যার জন্যে ভগবান তাকে এই সাজা প্রদান ক'ল্লেন। শিশির সব ভাবনা চিন্তা চুকিয়ে দিয়ে চলে গেছে, তার জন্যে আর আমার কোন চিন্তা কর্ত্তে হবে না। কিন্তু তার শেষ স্মৃতি,—আমার বৌমা,—তার চিন্তাই যে আমার এখন সব চেয়ে বেশী হয়েছে। মাকে এ কষ্ট থেকে কি করে ভুলিয়ে রাখবো সেই চিন্তাই আমি দিন রাত করছি।"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অভয়বাবু নীরব হইলেন,—একটা প্রকাণ্ড বেদনায় যেন তাহার কণ্ঠনালি আবদ্ধ হইয়া গেল। দেবেনবাবু মাথাটা নীচু করিয়া অভয়বাবুর বুকফাটা করুণ কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তিনি নীরব হইলে দেবেনবাবু মাথাটা তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি একটা কথা আপনাকে বল্‌বো বল্‌বো ভাবছিলুম,—যে পঙ্ককে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব,—এখন তার যে অবস্থা তাতে সে কিছু দিন তার জ্যাঠাইমার কাছে থাক্‌লে বোধ হয় অনেকটা শান্তি পাবে। তার যা সর্ব্বনাশ হয়ে যাবার তাতো হয়ে গেছে। এখানে থাকলে সেই কথাই কেবল মনে পড়বে। সে নিতান্ত ছেলে মানুষ,—তাই ভাবছি দিন কতক আমার ওখানে নিয়ে গিয়ে রাখবো।"

অভয়বাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দেবেনবাবুর কথার ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। মা আমার এখন যেখানে থাক্‌তে চাইবেন আমি তাকে সেইখানেই রাখবো। পৃথিবীতে আর আমার কোন অবলম্বন নেই,—বৌমাই

আমার সর্ব্বস্ব,—তাঁর মুখে আমি শিশিরের মুখ দেখ্‌তে পাবো।”

অভয়বাবু নীরব হইলেন, দেবেনবাবুও আর কোন কথা কহিলেন না। সমস্ত ঘরখানা যেন একটা নীরব বেদনায় নিঝুম হইয়া পড়িল। অভয়বাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া হাঁকিলেন, “ওরে কে আছিস। বৌমাকে একবার এইখান পাঠিয়ে দে।”

দ্বারের পার্শ্বেই ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল,—সে বাবুর আদেশ পাইয়া অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, “বৌমা ঠাক্‌রুণকে বাবু ডাক্‌ছেন।”

শ্বশুরের আহ্বান সংবাদ পাইয়া পঙ্কজিনী আসিয়া ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। দেবেনবাবু দ্বারের দিকে চাহিয়া ছিলেন,—তাঁহাব দৃষ্টি পঙ্কজিনীর উপর পতিত হইল। আজ তিন দিন তিনি পঙ্কজিনীকে দেখেন নাই। আজ সহসা তাহাকে দেখিয়া তিনি যেন তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। এই তিন দিনে তাহার আকাশ পাতাল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখে আর সে হাসি,—সে আনন্দ নাই, বিষাদ তথায় মনের সাধে আপন রাজ্য পাতিয়া সে মধুর হাসির সবটুকু একবারে হরণ করিয়া লইয়াছে। অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নাই,—শুভ্র থান পরিহিত,—এলায়িত রুক্ষ কেশ,—অঙ্গের প্রতি ভঙ্গিমায় একটা স্থির, ধীর, গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতেছে। পঙ্কজিনীর এই মূর্ত্তির পানে চাহিয়া দেবেনবাবুর সমস্ত প্রাণটা যেন কাঁদিয়া উঠিল।

তিনি সে দিকে অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না,—একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে দৃষ্টি নত করিলেন।

পঙ্কজিনীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া অভয়বাবু তাহার দিকে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা তোমার জ্যাঠামশাই, তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চান। এখন তোমার যেখানে থাকতে ইচ্ছে হয়, সেইখানেই থাকতে পারো। আমি বড় সাধ করে তোমাকে ঘরে এনেছিলেম,—ভেবেছিলেম তোমায় মনের মত করে সাজাবো পরাবো;—কিন্তু জানিনা কি মহাপাপ করেছি, যার জন্যে ভগবান সে সাধে আমার বাদ সাধ্‌লেন। যার জোরে মা তোমার ওপর আমার জোর ছিল, সে চিরদিনের মত আমার বুক ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেছে। আর মা তোমার ওপর আমার সে জোর নেই। তুমি জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে থাক আর যেখানেই থাক, তোমার স্বামীর ঘর চিরদিনই তোমার জন্যে উন্মুক্ত থাকবে। তুমি যে দিন আসবে সেই দিনই সে তোমায় মাথা পেতে গ্রহণ করবে। তোমার যে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে তাতে মা তোমার এখন কোথায় থাকা উচিত অনুচিত—তা বলবার এ সময় নয়। এখন তুমি যেখানে থেকে সোয়াস্তি পাও, সেইখানেই থাকতে পারো। তবে মা যেখানেই থাক, তোমার এ বুড়ো ছেলের কথা মাঝে মাঝে মনে ক'রো। তার আর কেউ নেই তুমিই এখন তার শেষ সম্বল।"

অভয়বাবু ধীরে ধীরে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিলেন,—কিন্তু আর বলিতে পারিলেন না,—পুত্রের স্মৃতি সহসা যেন তাঁহার

সমস্ত বুকটা কাঁপাইয়া, নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। চোখের জল ঝরঝর করিয়া গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। তিনি কোঁচার খুঁটে অশ্রুজল মুছিলেন। পঙ্কজিনী দ্বারের পার্শ্বে অতি সঙ্কোচিতভাবে মুখখানি নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া, স্তব্ধ হইয়া শ্বশুরের কথাগুলি শুনিতে ছিল। অভয়বাবুর বেদনা পূর্ণ কথাগুলি তাহার মরমে আঘাৎ করিল ;— দুই বিন্দু অশ্রু তাহারও নয়ন কোণে উচ্ছ্বলিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে অঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া অশ্রুজড়িত কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "বাবা আমিতো আপনাকে ছেড়ে যাব না। এখান থেকে অন্য কোথায় গিয়েও তো আমি সোয়াস্তি পাবো না। আপনি আমায় এইখানেই থাক্‌বার একটু স্থান দিন।"

পুত্রবধূর কথায় অভয়বাবুর সমস্ত প্রাণটা আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি পুত্রবধূর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিলেন,—"একটু স্থান দেব কি মা ! এই বাড়ী ঘর যা কিছু সবই যে মা তোমার। তোমার স্বামীর বাড়ী,—স্বামীর ঘর, এতে যে মা তোমার চিরদিনের অধিকার। সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার আমার তো শক্তি নেই মা। তোমার বাড়ী, তোমার ঘর,—দেখ্‌বে শুন্‌বে তুমি, আমি শুধু এক কোণে একটু মাথা গুজে পড়ে থাক্‌বো এই পর্য্যন্ত।"

পঙ্কজিনী কোন কথা কহিল না ; দেবেনবাবু ধীরে ধীরে পঙ্কের মুখের দিকে চাহিয়া অতি ম্লানস্বরে বলিলেন, "মা, আমি ভাব্‌ছি আজ রাত্রেই কল্‌কাতায় ফিরে যাব। নরুকে তো জান, তার সবই এলোমেলো। সেখানে কি হচ্ছে, না হচ্ছে তার কোন খবরই

পাইনি। তোমায় আর মা কি বলবো, কেমন থাকো মাঝে মাঝে এক একখানা চিঠি দিও।”

পঙ্কজিনী তথাপি কোন কথা কহিল না। অভয়বাবু দেবেনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “না আপনাকে আর থাকৃতে বল্‌তেও পারি না। আমার যা অবস্থা তাতে তো আমি কিছুই দেখ্‌তে শুন্‌তে পাচ্ছিনি। এখানে থেকে শুধু শুধু কষ্ট করবার আপনার কোন দরকার নেই।”

তারপর পঙ্কজিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “যাও মা বাড়ীর ভেতর যাও। তোমার জ্যাঠামশাই যাবেন আজ রাত্রে। যাবার আগে তাঁর সঙ্গে আবাব তোমার দেখা হবে।”

শ্বশুরের কথা শেষ হইবামাত্র পঙ্কজিনী ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। দেবেনবাবু সারাদিন নানা চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া, একরাশ বেদনা বুকে পুরিয়া, রাত্রের গাড়ীতে একাকী কলিকাতায় ফিরিলেন। আসিবার সময় পঙ্কজিনীর যে ম্লান মুখখানি দেখিয়া আসিয়াছিলেন, গাড়ীতে সারা রাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাই কেবল তাঁহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

দুঃখটা যখন আসে, তখন সেটা যেন ভাবিবার সময়টুকু পর্য্যন্ত না দিয়া, সংসারের উপর একেবারে হুমড়ি খাইয়া আসিয়া পড়ে। সংসারের সবটুকু শান্তি, সবটুকু আনন্দ যেন তাহাব স্পর্শে একেবারে ধ্বংশ হইয়া গিয়া, চারিদিকে একটা তাণ্ডব নৃত্য চলিতে থাকে। দেবেনবাবুর সংসারের অবস্থাও ঠিক তাহাই হইল। পঙ্কজিনী বিধবা হইবার পর ছয় মাস উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই একেবারে সব ওলোট-পালোট হইয়া গেল। বাঁধভাঙ্গা নদীর মত বিপদ তাঁহার সংসারের ভিতর চারিদিক হইতে হু হু শব্দে প্রবেশ করিতে লাগিল। পঙ্ক যেন তাঁহার সংসারের শান্তিদেবা ছিল, তাহার অভাবে সমস্ত সংসারটা যেন একটা অশান্তির আবাস স্থল হইয়া দাঁড়াইল। দেবেনবাবু তাঁহার শান্তির সংসারে আর এতটুকুও শান্তি দেখিতে পাইলেন না, ভাবনায় চিন্তার তিনি একেবারে জীবন্মৃত হইয়া পড়িলেন।

পঙ্কজিনীর বিধবা হইবার সংবাদটা নরেন্দ্রনাথ সহ্য করিতে পারিল না, সে তাহাতে যে আঘাৎ পাইল, তাহাতেই তাহার সমস্ত দেহটা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পঙ্কজিনীর বিবাহের পর তাহার সমস্ত হৃদয়টা একেবারে শূন্য হইয়া গিয়াছিল, সে ভাবিয়াছিল বিবাহ করিয়া সেই শূন্যটা পূর্ণ করিবে, কিন্তু তাহাতে পূর্ণ তো হইলই না, বরং লালিত্যময়ীর আচরণগুলা যেন কুল

কাঁটার মত তাহার হৃদয়ের চারিপার্শ্বে বিদ্ধ হইতে লাগিল। পঙ্কজিনীর বিবাহের পর হইতেই নরেন্দ্রনাথের আহারে অরুচি হইয়াছিল,—তাহার বিধবা হইবার সংবাদটা পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘুস্‌ঘুসে জ্বর আরম্ভ হইল, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহাকে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। দেবেনবাবুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি পুত্রের চিকিৎসা করাইতে কিছুই বাকি রাখিলেন না, কিন্তু কিছুতেই কোন সুফল দর্শিল না, নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পুত্রের অবস্থা দেখিয়া কাত্যায়নীর বুকের রক্ত জল হইয়া গেল, তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। তিনি দিনরাত্র পুত্রের শিহরে বসিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন পুত্রের শিহরে বসিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার পর কাপড়টা কাচিবার জন্য কাত্যায়নী একবার নীচে নামিয়াছিলেন; সত্বর কাপড়টা কাচিয়া উপরে উঠিতেছিলেন, সহসা বধূর গৃহের ভিতর দৃষ্টি পড়ায় তিনি একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। লালিত্যময়ী তাহার বড় ট্রাঙ্ক খুলিয়া কাপড় চোপড় গুছাইতেছে। এ সময় সহসা বধূর কাপড় চোপড় গুছাইবার এত ঘটা পড়িয়া গেল কেন, জানিবার জন্য তিনি ধীরে ধীরে লালিত্যময়ীর গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পুত্রের বিবাহের পর পুত্রবধূর রূপের প্রভায় মুগ্ধ হইয়া তিনি যে আনন্দে পুত্রবধূকে গৃহে তুলিয়াছিলেন, কিছু দিন বধূর সহিত ব্যবহারের পর তাঁহার আর সে আনন্দের কিছুই ছিল না। বধূর আচরণ সময় সময় তাহার এমনই তীব্র ঠেকিত

যে তাঁহার চক্ষে জল আসিয়া পড়িত, কিন্তু তথাপি নীরবে তিনি সবই সহ্য করিতেছিলেন। তিনিই দেখিয়া শুনিয়া লাল টুক্‌টুকে বৌ গৃহে আনিয়াছেন, এখন আর অনুতাপ করিলে কি হইবে! দুঃখের কথাটা মুখ ফুটিয়া জানাইবারও তাঁহার আর মুখ ছিল না। কাত্যায়নী নীরবে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ বধূর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বৌমা, এমন সময় বসে ট্রাঙ্ক গুচুচ্ছো কেন? নরুর বালিটা একটু গরম করে আন্‌লেও তো পারতে। সে একলাটী পড়ে আছে, একটু পাশে বসে মাথাটায়ও তো হাত বুলিয়ে দিতে পার্‌তে।"

শাশুড়ীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বঙ্কিম গ্রীবায় লালিত্যময়ী শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল, অতি কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দিল, "দিন রাত রুগীর পাশে বসে থাকা আমার কর্ম্ম নয়, চুপটি ক'রে বসে মাথায় হাত ফাত বুল্‌তে আমি পারবো না। তারপর আমার যখন ব্যামো হবে তখন দেখ্‌বে কে? তাছাড়া আস্‌ছে সোমবার আমার পিস্‌তুতো ভায়ের বিয়ে, আমাকে কালই সেখানে যেতে হবে—"

বধূর কথায় কাত্যায়নী একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, স্বামী মৃত্যু শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে, তবুও মানুষের পিস্‌তুতো ভায়ের বিবাহের আনন্দ করিতে যাইতে ইচ্ছা হয়। বধূর কথায় কাত্যায়নীর সমস্ত বুকটা কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, তিনি মহা বিস্মৃত স্বরে বলিলেন, "সে কি

কথা, নরুকে এই অবস্থায় ফেলে তুমি তোমার পিস্‌তুতো ভায়ের বিয়েতে যাবে? যেতে ইচ্ছেও তো মানুষের হয়! ডাক্তার কি বলেছে তা তো সবই শুনেছো।"

কাত্যায়নী আর বলিতে পারিলেন না, দুই ফোটা অশ্রু তাঁহার নয়ন বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। লালিত্যময়ী মুখখানা ভার করিয়া বলিল, "শুন্‌বো না কেন, ডাক্তাব এমন আর কি বলেছে, বলেছে এখন তেমন বিশেষ—"

বধূর উত্তর শুনিয়া, আর কোন কথা কহিতেই কাত্যায়নীর ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু পুত্রের মুখ চাহিয়া তিনি ধীরে ধীরে আবাব বলিলেন, "ডাক্তার যাই বলুক, তুমিতো সব দেখতে পাচ্ছ, নরুর এই দশা দেখে যাবে কি করে? সেখানে গিয়ে সুস্থির হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে? মানুষে কি এ পারে? তা ছাড়া কাল আমরা নরুকে নিয়ে হাওয়া বদলাবার জন্যে মধুপুর যাব, আর তুমি এই সময় বাপের বাড়ী চলে যাবে?"

লালিত্যময়ী ঠোঁট দুইখানি উল্‌টাইয়া বলিল, "মা এত করে লিখেছে আমায় যেতেই হবে। আমার পিসে মশায়ের ওই একটী মাত্র ছেলে, মা লিখেছে বিয়েতে খুব ধুম হবে, আমি না গেলে পিসিমা ভারি দুঃখ করবেন। মারও মনে কষ্ট হবে।"

বধূর উপরে যেটুকু শ্রদ্ধা কাত্যায়নীর এত দিন ছিল, বধূর এই কথাবার্ত্তায় সেটুকুও তাঁহার নষ্ট হইয়া গেল। ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় তাঁহার নয়ন ফাটিয়া জল আসিবার মত হইল। তিনি অশ্রু জড়িত কণ্ঠে, বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তোমার

মায়ের ভাব বাছা আমি বুঝতে পারিনি। দেখ বৌ অনেক সয়েছি, কিন্তু তুমি যদি এ সময় নরুর এই অবস্থা দেখেও বাপের বাড়ী চলে যাও, তা কিন্তু আর কিছুতেই সইবো না। তোমার মা তোমায় যাই বলুন,—কিন্তু আমি তোমার বাবার মন ভালো রকমই জানি, এ অবস্থায় তুমি যদি আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও বাপের বাড়ী যাও, তিনি তাতে কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না।"

লালিতাময়ীও বেশ একটু উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিল, "বাবা সন্তুষ্ট হবেন কি না হবেন সে বিবেচনা তো আমার। আমি যখন বলেছি যাব, তখন যাবই। আমাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। আমি কিছু করিওনি—কিছু কর্ত্তেও পারিনি। বাড়ীতে সব চুপ চাপ,—আমার দম আটকে যাবার মত হয়েছে। আমি কাল যাবই।"

বধূর কথার উত্তর দিতে পর্য্যন্ত কাত্যায়নীর ঘৃণা বোধ হইল। "যা ইচ্ছে তোমার কর বাছা"—বলিয়া রাগে, ঘৃণায় একবার মাত্র বধূর দিকে একটা কাতর দৃষ্টে চাহিয়া, তিনি সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া, বরাবর স্বামীর গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহের মধ্যস্থলে একখানা গদি আঁটা চেয়ারের উপর আড় হইয়া পড়িয়া দেবেনবাবু পুত্রের পীড়ার কথাই চিন্তা করিতেছিলেন,—আর মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বুকের বোঝাটা হাল্কা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। দেবেনবাবু মনে মনে স্থির বুঝিয়াছিলেন,— দুঃখ যখন একবার একটা ছুতা ধরিয়া সংসারে ঢুকিয়াছে, তখন সে সমস্ত সংসারটা একেবারে ছারখার না করিয়া দিয়া ছাড়িবে না।

পৃথিবীতে তাঁহার দুইটী স্নেহের ফুল ফুটিয়াছিল,একটা তাহার বাসনা কামনা সমস্ত জলাঞ্জলী দিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছে, অপরটী নিজের ভুলে, অনুতাপের তুষানলে জ্বলিয়া জ্বলিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে অগ্রসর হইতেছে। পুত্রের ব্যাধি যে কি, বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ ধরিতে না পারিলেও দেবেনবাবু ধরিয়াছিলেন,—ডাক্তার কবিরাজ যাহাই বলুক, তিনি স্থির জানিতেন এ ব্যাধির ঔষধ নাই। ঔষধ যাহা ছিল, তাহা প্রয়োগ করিবার এখন আর উপায় নাই। কাজেই পুত্রের দেহে শত ঔষধেও আর কোন দিন রক্ত হইবে না, পুত্রের মৃত্যু স্থির নিশ্চিত। পত্নীকে ব্যস্তভাবে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দেবেনবাবুর সমস্ত প্রাণটা ধড়াস করিয়া উঠিয়াছিল, তিনি পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নরুর কি অসুখ বেড়েছে ?"

কাত্যায়নী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না। হ্যাঁগা ক'দিন থেকে সাহেব ডাক্তার তো দেখছেন, তিনি কি কল্লেন, নরু বাঁচবে তো ? কোন ভয় টয় নেই তো ?"

পত্নীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া দেবেনবাবু আবার কেদারাখানার উপরে উঠিয়া বসিয়াছিলেন, পত্নীর কথার কোন উত্তর দিলেন না, একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলিয়া আবার কেদারাখানার উপর আড় হইয়া পড়িলেন। দেবেনবাবুর সেই নিশ্বাসের শব্দে কাত্যায়নীর সমস্ত বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল ; তাঁহার ম্লান মুখখানি আরও ম্লান হইয়া গেল। একমাত্র পুত্রের

জননীর প্রাণ, পুত্রের একটুখানি অমঙ্গলের সূচনা হইলে কেমন করিয়া উঠে তাহা অপরের অনুভব করা অসম্ভব। কাত্যায়নীর নয়নে জল আসিল, তিনি মহা ব্যাকুল কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি অমন করে নিশ্বেস ফেল্‌লে কেন? তবে কি নরু আমার বাঁচবে না? ডাক্তার সাহেব কি তাই বল্লেন?"

কাত্যায়নীর কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসিতেছিল, তাঁহার স্বর বন্ধ হইয়া গেল, তিনি শুধু একটা ব্যাকুল দৃষ্টি লইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। দেবেনবাবু পত্নীর সেই দৃষ্টির ভিতর কত বেদনা লুকাইত তাহা বুঝিলেন। বেদনার ভারে তিনি নিজেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে ছিলেন, তথাপি প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে একটু দৃঢ় করিয়া লইয়া বলিলেন, "বাঁচা মরা ভগবানের হাত, কে বাঁচবে, কে মরবে মানুষের বলা তা কঠিন। ডাক্তারেরা বলেন এ রোগের ওষুধ নেই। এ রোগের একমাত্র ওষুধই হচ্চে জল বায়ু পরিবর্ত্তন। তাই কাল নরুকে নিয়ে মধুপুরে যাব, শুনেছি সেখানকার জল বায়ু নাকি খুব ভাল। গিন্নি ভগবানকে ডাক, তিনি যদি নরুকে নেন, তোমার আমার সাধ্যি কি যে তাকে আটকে রাখতে পারি।"

স্বামীর কথায় কাত্যায়নী একেবারে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার নিশ্বাস দ্রুত পড়িতে লাগিল। দেবেনবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরুর জ্বর কি আর বেড়ে ছিল?"

কাত্যায়নী বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, উত্তর দিল, "হাঁ, আজও দুপুর থেকে জ্বর বেড়েছে, এখনও তো খুব জ্বর রয়েছে।"

দেবেনবাবু বাঁ হাতখানায় চোখ দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কেবল-মাত্র বলিলেন, "হু।"

দেবেনবাবু আর কোন কথা কহিলেন না, কাত্যায়নী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া তথায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে-ছিলেন, দোরের নিকট যাইয়া ফিরিয়া বলিলেন, "বৌমা কাল বাপের বাড়ী চ'লে যাচ্ছে।"

"বাপের বাড়ী চলে যাচ্ছেন!" দেবেনবাবু বেশ একটু বিস্মিত ভাবে পত্নীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সময় হঠাৎ বাপের বাড়ী যাচ্ছেন কেন,—বেয়াই, বেয়ান ভালো আছেন তো?"

কাত্যায়িনী ঘাড়টা নাড়িয়া বলিলেন, "হু,—তার পিস্‌তুতো ভায়ের বিয়ে, তাই তার মা তাকে যেতে লিখেছে।"

দেবেনবাবু গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "বেয়ান বোধ হয় জানেন না যে নরুর এমন শক্ত ব্যায়রাম। তাঁকে সব খুলে এক-খানা পত্র লিখে দাও। বৌমার এ সময় যাওয়াটা ঠিক নয়। আর নরুর এ অবস্থা দেখে বৌমাই বা যেতে চাইবেন কেন।"

স্বামীর কথায় কাত্যায়নীর মুখখানি একেবারে ম্লান হইয়া গেল। স্বামীর কথার উত্তরে তিনি অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "বৌমা তার পিস্‌তুতো ভায়ের বিয়েতে যাবেই। নরুর এ অবস্থায় তার যাওয়া যে উচিত নয়—সে কথাও আমি তাকে বল্‌লুম, তবুও সে যাবেই।"

দেবেনবাবু বলিলেন, "তার ওপর আর কথা কি বল। তিনি

যখন যাবেনই, তখন তাঁকে আর জোর করে আটকে রেখে লাভ কি? গিন্নি যে ভুল করেছ, তা আর এখন শোধরাবার কোন উপায় নেই। একজন ছিল, যে তোমার নিষেধ ভগবানের নিষেধের মত মাথা পেতে নিত। যাক্ সে কথা আব এখন ভেবে কি হবে যা হবার তা হবেই।”

দেবেনবাবু দুই হস্তে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কাত্যায়নী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বাতাসে সম্মুখের জানালাটা একটু ফাঁক হইয়া গিয়াছিল, নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেই ফাঁকটুকুর ভিতর দিয়া নিবিড় কালো আকাশের উপর যাইয়া পড়িল। আজ তিন চারি মাস বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া সে কেবলই রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, অন্ধকার রাত্রের এমন আকাশ সে কতদিন দেখে নাই। কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, আকাশ মৃত্যুর পোষাক পরিয়া আজ তাহার সম্মুখে একবারে তাহার কালো বুকখানার সবটুকু বিস্তারিত করিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্বব্যাপী এই বিরাট অন্ধকারের ভিতর জগতের সমস্ত আলো অতি শীঘ্রই তাহার চক্ষের সম্মুখে একেবারে চিরদিনের মত কালো হইয়া যাইবে। সকলই সকল দেখিতে পাইবে, সেই কেবল দেখিতে পাইবে না। স্নেহ, মমতা, ভালবাসা বিশ্বের যাহা কিছু বন্ধন ক্রমেই যেন তাহার সমস্তই শিথীল হইয়া পড়িতেছে, দুই দিন পরে একেবারেই ছিন্ন হইয়া যাইবে। ওই কালো আকাশের কোটী তারা মিট মিট করিয়া আজ যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। সহসা সেই কালো আকাশের একটা বড় তারা তাহার চক্ষের উপরে বেশ একটু জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল ;—সেই তারার ভিতর হইতে একখানি তাহার বড় পরিচিত,—বড় আপনার মুখ যেন উঁকি দিল। সে মুখখানি

শোকের কালিমায় একেবারে নিবিড় কালো হইলেও, নরেন্দ্রনাথ তাহা দেখিবামাত্র চিনিল,—মুখখানি পঙ্কজিনীর। সেই একটু-খানি পঙ্ক ধীরে ধীরে যেন বিশ্বরূপ ধরিল,—তাহার এলোচুলের উপর আকাশেব তারাগুলি যেন গিরিরাণীর কন্যা গৌরীর স্বহস্তে বচিত আশীর্ব্বাদের মালার মত দুলিতে লাগিল,—একটা শান্ত স্নিগ্ধ জননী ভাবে তাহার সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জীবন মরণের সঙ্গম তীর্থে নরেন্দ্রনাথ পঙ্কজিনীর এই মূর্ত্তির দিকে চাহিতে পারিল না,—চক্ষু মুদ্রিত করিল। এক ফোটা অশ্রু নয়ণ কোণে উচ্ছলিয়া উঠিয়া গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

পুত্রের শিহরে বসিয়া, কাত্যায়নী অনিমেষ নয়নে পুত্রের রোগক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। পুত্রের নয়নে অশ্রু দেখিয়া, জননীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,—তিনি তাড়াতাড়ি অঞ্চলে পুত্রের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া অতি করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা বড্ড কি কষ্ট হচ্ছে ?"

আজ দুই সপ্তাহ হইল, দেবেনবাবু পুত্রকে লইয়া মধুপুর আসিয়াছেন। মধুপুরে আসিয়া প্রথম প্রথম দুই চারি দিন নরেন্দ্র-নাথ বেশ ভালই ছিল ; কিন্তু তারপর হইতে রোগের গতিটা এত দ্রুত বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে,—যে আর তাহার জীবনের আশা করিবার কিছুই নাই। বহু পূর্ব্বেই ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন,—এখানে আসিয়া নরেন্দ্রনাথের দেহের হাড় গুলিও ক্রমে ক্রমে ছাল ছাড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। জননীর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করায় নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে আবার চক্ষু

মেলিল; মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, "কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু মা তুমি যত কষ্ট মনে কচ্ছ তত কষ্ট হচ্ছে না। আমার কষ্টের ক্রমশই যেন সব শেষ হ'য়ে আসছে। মা ছেলে-বেলায় ঠাকুরমার মুখে যে সব গল্প শুনেছি,—এখন তাই আমার একে একে মনে পড়্ছে। রাক্ষসের মেয়েরা যেমন সোনার কাটি ছোয়ালেই বাঁচতো, আর রূপোর কাটি ছোয়ালেই মরতো, আমারও যেন তাই হ'লো। সোণার কাটি দূরে ফেলে দিয়ে যেমন রূপোর কাটি স্পর্শ করিছি, অমনি ধীরে ধীরে মরতে চলেছি। মা আমার মনে হয়,—রাক্ষসদেরও এই রকম একটা কিছু ছিল,—সোনার কাটি রূপোর কাটি ওসব বাজে কথা, যার স্পর্শে মানুষ মরতো, যার স্পর্শে মানুষ বাঁচতো।

কাত্যায়নী একটা কাচের পেয়ালা হইতে এক চামচে বেদানার রস লইয়া, পুত্রের মুখের নিকট ধরিয়া বলিলেন,—"এক চাম্‌চে বেদানার রস খা,—নইলে গলা শুকিয়ে যাবে।"

নরেন্দ্রনাথ বালিশ হইতে অতি কষ্টে মাথাটা একটু তুলিয়া বলিল, "খেতে মা কিছুই আর ইচ্ছে করে না,—কিন্তু মা তুমি দিচ্ছ, না বল্‌তে পারিনি,—তোমার হাতের দেওয়া জিনিষ আর দু'দিন বাদে হয়তো খেতে পাবো না, সেইটাই আমার সব চেয়ে বড় কষ্ট, তার চেয়ে আর আমার বেশী কষ্ট কিছুই হচ্ছে না।"

কাত্যায়নী সেই বেদানার রসটুকু পুত্রের মুখে ঢালিয়া দিলেন, নরেন্দ্রনাথ অতি কষ্টে তাহা গলাধঃকরণ করিল। একটুখানি নীরব থাকিয়া আবার বলিল, "মা আমি ভাবছি, সে কেমন করে

এ সময় তার পিস্‌তুতো ভায়ের বিয়েতে চলে গেল,—স্বামীর এ অবস্থা দেখে কখন যে কোন স্ত্রী বিয়ের আমোদ কর্ত্তে যেতে পারে, এমন কথা কখনতো কারুর মুখে মা কোন দিন শুনিনি। চিরদিন' মা শুনে এসেছি, স্বামীর পায়ে একটু কাঁটা ফুট্‌লে সে বেদনাটুকুও স্ত্রী অনুভব করে। তবে মা এমন হ'লো কেন? সে বড় ছেলে মানুষ, সে হয়তো মা বুঝতেই পাচ্ছে না যে, দুদিন পরে তাব সব আমোদ প্রমোদ ফুরিয়ে যাবে।”

কাত্যায়নী পুত্রের কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না,—টস্‌টস্‌ করিয়া কেবলই তাঁহার নয়ন ফাটিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল,—“মা আমার মনে হয়, মানুষ সব কথা সব সময় বুঝতে পারে না। তারা না বুঝে এমন অনেক কাজ করে বসে যার জন্যে চিরদিন অনুতাপ করেও শেষ কর্ত্তে পারে না। তাই মা আমার সময় সময় মনে হয় এই পৃথিবীটা বুঝি সব মিথ্যে দিয়ে ঢাকা! সত্য জিনিষ এখানে নেই বল্‌লেই হয়। যদি দুই একটা থাকে তাও চিনে নেওয়া কঠিন।”

কাত্যায়নী কোন ক্রমে তাঁহার অশ্রু দমন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—“ঘুমো না নরু, রাত যে ঢের হ'লো। রাত জাগ্‌লে আবার অসুখ বাড়বে।”

জননীর কথায় পুত্রের মুখের উপর একটু মৃদু হাসির ছায়া পড়িল,—নরেন্দ্রনাথ মৃদু স্বরে বলিল, “অসুখ বাড়বার মা আর

কিছু তো নেই। এখন যতক্ষণ তোমায় দেখতে পারি—সেইটুকুই যে আমার লাভ!”

সহসা চমকিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ দরজার দিকে চাহিল,—বেশ একটু উদ্‌গ্রীব ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “মা ও দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কে—ওই যে—”

পুত্রের কথায় কাত্যায়নীর দৃষ্টি দরজার দিকে পতিত হইল,—তিনি পুত্রের কথার উত্তরে তাড়াতাড়ি বলিলেন, “কই ওখানে তো কেউ নেই।”

মাতার কথায় নরেন্দ্রনাথ বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল,—সে তখনও স্পষ্ট দেখিতেছিল, দরজার পাশটিতে পঙ্কজিনী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটী মোটা মোটা জলের ফোঁটায় ভরা,—সে জলের যেন শেষ নাই,—তাহা যেন অনন্তকালের জন্য ভরিয়া রহিয়াছে। সে মহা ব্যাকুলভাবে বলিল, “মা তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না,—ওই যে দরজার পাশে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি মা দেখদেখি উঠে,—উঠ্‌লেই দেখতে পাবে।”

দরজার পার্শ্বে কেহই দাঁড়াইয়া ছিল না,—কাত্যায়নী তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন। তথাপি তিনি পুত্রের মনের ভুলটা মিটাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ধীরে ধীরে যাইয়া দরজাটা একটু খুলিলেন। রোগীর দরজার পশ্চাতে স্তব্ধ রাত্রি কৃতান্ত-কিঙ্করের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সহসা দরজাটা খুলিয়া যাওয়ায় সে যেন চমকিত হইয়া একটুখানি সরিয়া গেল। কাত্যায়নী

আবার দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া দিয়া পুত্রের শিহরে আসিয়া বসিলেন বলিলেন, "কই ওখানে তো কেউ নেই।"

নরেন্দ্রনাথ জননীর কথার কোন উত্তর দিল না;—কাত্যায়নী আস্তে. আস্তে তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। এইবার নরেন্দ্রনাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া, কাত্যায়নী যখন স্থির নিশ্চিত হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় নরেন্দ্রনাথ আবার চক্ষু মেলিয়া বলিল, "মা পঙ্কীকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে। আমার দিন রাতই যেন মনে হয় সে এসে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছ। সে যেন আমায় বল্‌ছে, নরেনদা! আমি তোমার ছোট বোনটী,—আর ত আমার কেউ নেই। তুমি যদি আমায় ফেলে চলে যাও,—তবে কে আমায় দেখ্‌বে। মা সে তোমার পেটের মেয়ে না হ'লেও,—সে মা তোমাকেই মা বলে জানে। পৃথিবীতে তার আপনার বলতে আর কেউ রইলো না,—দেখ মা সে যেন না কোন দিন কষ্ট পায়।"

কাত্যায়নী পুত্রের কথার উত্তরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "কাল পঙ্কীর শ্বশুরকে টেলিগ্রাম করা হ'য়েছে, আজ কালের ভেতর নিশ্চয়ই সে এসে পৌঁছুবে।"

পঙ্কজিনীকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাফ করা হইয়াছে শুনিয়া নরেন্দ্রনাথের সমস্ত প্রাণটা বিদ্যুতের মত একবার দরদর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে জননীর মুখের দিকে চাহিয়া অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, "তাকে আনবার জন্যে আবার টেলিগ্রাম করা হ'লো কেন মা? তার সেদিন যে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে সেই সর্ব্বনাশের ধাক্কাই

সে এখন সামলাতে পারিনি। এ সময় তাকে আমার অসুখের কথা জানানো ভাল হয়নি। মা সেতো তার সব সুখই জলাঞ্জলী দিয়েছে,—এ সময় তাকে একটু শান্তি পাবারও অবসর দেওয়া উচিত ছিল।”

নরেন্দ্রনাথ আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মা এখন রাত্তির কটা ?”

গৃহের প্রাচীরের গাত্রে ব্রাকেটের উপর ঘড়ী রাত্রের পরিমাণ জ্ঞাপন করিয়া ক্রমাগত টিক্‌টিক্‌ করিতেছিল। কাত্যায়নী একবার ব্রাকেটের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “রাত্তির এখন ন’টা।”

নরেন্দ্রনাথ আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “সবে ন’টা। আমি ভাবছিলুম বুঝি রাত্তির বারটা একটা বেজে গেছে। তবে মা তুমি আমার ঘুমের জন্যে অত ব্যস্ত হয়েছিলে কেন ? রাত্তির তো এখন মোটেই হয়নি।”

কাত্যায়নী পুত্রের কথার উত্তরে আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় দরজাটা ধীরে ধীরে একটু ফাক্ হইয়া গেল ;—গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন দেবেনবাবু। তিনি আর সে দেবেনবাবু নাই, পুত্রের কথা চিন্তা করিয়া করিয়া বার্দ্ধক্য আসিয়া তাঁহাকে একেবারে জড়ীভূত করিয়া দিয়াছে। গৃহের ভিতরকার আলোটা অতি মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল,—তিনি সেটাকে একটু সতেজ করিয়া দিয়া, পত্নীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “নরু কি ঘুমিয়েছে ?”

কাত্যায়নী মাথাটা নাড়িয়া উত্তর দিলেন, “না।”

দেবেনবাবু ধীরে ধীরে রোগীর রোগ শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আস্তে আস্তে পুত্রের কপালে হাতখানা স্পর্শ করিয়া জ্বরের উত্তাপটা অনুভব করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখখানা আরোও ম্লান হইয়া পড়িল। তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটা ক্ষীণস্বর বাহির হইল, "আজ দেখ্‌ছি জ্বরটা আর একটুও কমলো না।"

কেহ কোন উত্তর দিল না,—দেবেনবাবু একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "বেয়াই মশাইকেও আজ একখানা টেলিগ্রাম করে দিলুম,—নরেনের অবস্থার কথা জানিয়ে লিখ্‌লুম বৌমা যদি আস্‌তে চান,—তাঁকে যেন অবিলম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।"

স্বামীর কথায় কাত্যায়নী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বৌমা যে আসবে তা ব'লে তো আমার বোধ হয় না।"

দেবেনবাবু মাথাটা নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "আমার যা কাজ আমি তা কল্লুম,—এখন আসা না আসা তাঁর ইচ্ছে। পঙ্ককেও পাঠিয়ে দেবার জন্যে কাল অভয়বাবুকে টেলিগ্রাম করেছি সে নিশ্চয় কালই এসে পৌঁছিবে।"

পঙ্কজিনীর নাম কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র নরেন্দ্রনাথের নাড়ী সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে কেবলমাত্র একটা মহা অপ-রাধীর দৃষ্টি লইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিল। দেবেনবাবু বলিতে লাগিলেন, "কাল এখানে নেপালের মহারাজা এসেছেন,—শুন্‌লুম এখানে নাকি তিনি কিছু দিন থাক্‌বেন। তার সঙ্গে একজন মস্ত বড় কবিরাজ এসেছেন; তার কাছে নাকি মহা কঠিন

কঠিন রোগের অব্যর্থ ওষুধ আছে। কাল একবার তাঁর কাছে যাব। তাঁকে যদি একবার নরুকে দেখাতে পারি—দেখি একবার চেষ্টা করে।"

কাত্যায়নীর চারিপার্শ্বে নিরাশার অন্ধকার একেবারে কালো হইয়া উঠিয়া ছিল, স্বামীর কথায় তাহারই ভিতর যেন একটু আলো চিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "হাঁ, তা হ'লে কালই একবার তাকে নিয়ে এস। অত বড় রাজার যখন তিনি কবিরাজ তখন নিশ্চয়ই তিনি মস্ত জ্ঞানী লোকই হবেন।"

দেবেনবাবু মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "হওয়াই সম্ভব। তবে তিনি আস্‌বেন কিনা বল্‌তে পারিনি। দেখি কি হয়।"

কাত্যায়নী কোন উত্তর দিলেন না, দেবেনবাবু একটুখানি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, দরজার নিকট যাইয়া ফিরিলেন, পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরুকে ওসুধ একদাগ খাইয়ে দেওয়া হয়েচে ?"

কাত্যায়নী ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "হাঁ।"

দেবেনবাবু আর কোন কথা কহিলেন না। তিনি পুত্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ চক্ষু মুদিয়া শুইয়া ছিল, দরজা খোলার শব্দে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। কালো আকাশের তারাগুলি করুণা বিগলিত চখের জলের মত, তাহার চক্ষের সম্মুখে জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল। সে

একবার বালিস হইতে মাথাটা একটু উঁচু করিয়া তুলিল, তাহার পর মৃত্যু যে হাতখানি তাহাকে লইবার জন্য বাড়াইয়া দিয়াছে,— সে যেন একটা নিবিড়বিশ্বাসের সহিত তাহারই উপর তাহার রোগাক্রান্ত দেহটা ধীরে ধীরে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া শেষ রাত্রে নরেন্দ্রনাথের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। একখানি কোমল নারী হস্ত স্পর্শে যখন সে চোখ মেলিয়া চাহিল,—তখন প্রভাতের রৌদ্র উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া মেঝের উপর লুটোপুটি খাইতেছিল। চক্ষু মেলিয়া নরেন্দ্রনাথ শিয়রের নিকট যাহাকে দেখিল তাহা যেন তাহার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। প্রত্যহই সে আশে পাশে যাহাকে দেখিতেছে, সেই তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার কোমল হস্তে ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতেছে। নরেন্দ্রনাথ স্থির দৃষ্টিতে সেই মূর্ত্তিখানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা আকুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

নরেন্দ্রনাথের সঙ্কট পীড়ার সংবাদ পৌছিবামাত্রই পঙ্কজিনী রওনা হইয়াছিল, সে যখন মধুপুরে দেবেনবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও রাত্রি শেষ হইবার কিছু বাকি ছিল,—নরেন্দ্রনাথ সেই সবে মাত্র নিদ্রিত হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু মলিন পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া পঙ্কজিনীর বুকটা ফাটিবার মত হইল। পাছে তাহার নরেনদার নিদ্রা ভঙ্গ হয়, সেই আশঙ্কায় সে একটীও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া পাষাণের মত তাহার শিয়রের নিকট বসিয়াছিল ;—তাহার পর

দুই তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে,—নিশার পর উষা,—উষার পর দিনের আলো বাড়িয়া উঠিয়াছে,—তথাপি সে একটীও কথা কহে নাই—কিংবা তথা হইতে একবারও নড়ে নাই। নরেন্দ্রনাথের চক্ষুর জলধারা অঞ্চলে মুছাইয়া দিয়া পঙ্কজিনী তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া মহা আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন আছ নরেনদা? বড় কি কষ্ট হচ্ছে?"

নরেন্দ্রনাথের ঠোঁট দুইটী ঈষৎ নড়িয়া উঠিল, মুখ হইতে স্পষ্ট কোন কথা বাহির হইল না,—কাত্যায়নী গৃহের মেঝের উপর বসিয়া বেদানার রস করিতেছিলেন, নরেন্দ্রনাথের শয্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"নরু চোখ চেয়ে দেখ, কে এসেছে?"

জননীর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে আবার চোখ মেলিয়া চাহিল,—যাহা স্বপ্ন ভাবিয়া সে তাড়াতাড়ি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিল,—তাহা যে স্বপ্ন নয় এতক্ষণে তাহার দৃষ্টির নিকট তাহা ধরা পড়িল! তাহার দৃষ্টি পলকশূন্য হইয়া পঙ্কজিনীর দেহের দিকে,—বেশের দিকে স্থির হইয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার রোগ যন্ত্রণায় অমৃত প্রলেপ দিবার জন্য স্বর্গ হইতে কোন দেবী আসিয়া তাহার শিয়রে বসিয়াছে। তাহার নিরাভরণ হাত দুইখানি যেন রোগীর পরিচর্য্যার জন্যই সুনিপুণ হইয়া উঠিয়াছে,—তাহা অঙ্গ স্পর্শে অমৃত সিঞ্চন করে। সেই ছেলেবেলাকার পঙ্কজিনী,—সেই হাস্যভরা মুখখানি কি স্থির,—কি গম্ভীর। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য আজ যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। সেই সৌন্দর্য্যের

দিকে চাহিয়া চাহিয়া নরেন্দ্রনাথের সমস্ত হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। একটা মধুর আনন্দে তাহার কণ্ঠস্বর রোধ হইয়া গেল,—নয়নে অশ্রু উছলিয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথের বেদনা-ভরা দৃষ্টির দিকে চাহিয়া পঙ্কজিনীর সমস্ত প্রাণ আলোড়িত.হইয়া উঠিয়াছিল; ভিতরে অশ্রু সমুদ্র তোলপাড় করিতেছিল, সে নিজেকে একটু দৃঢ় করিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "নরেনদা কেমন আছ?"

নরেন্দ্রনাথ তাহার ডান হাতখানি দিয়া চোখটা একটু মুছিয়া অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল, "এখন বেশ ভালই আছি!"

সে ক্ষীণ বেদনা পরিপূর্ণ করুণ কণ্ঠস্বর বিষের তীরের মত পঙ্কজিনীর হৃদয়ে যাইয়া আঘাৎ করিল, সে আঘাতে তাহার দেহের সমস্ত তার একেবারে যেন করুণ সুরে কাঁদিয়া উঠিল,—সে নয়ন অশ্রু আর কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না,—নয়ন ফাটিয়া চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা টস্‌টস্‌ করিয়া গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। শত সহস্র প্রশ্ন একসঙ্গে কণ্ঠ নালীতে জড় হইয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল,—সে আর একটীও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, স্থির দৃষ্টিতে নরেন্দ্রনাথের শুষ্ক মলিন পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্রনাথ নীরবে পঙ্কজিনীর সেই অশ্রুপ্লাবিত মুখখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঈষৎ যেন একটু নড়িল,—তাহার পর অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বাহির হইল, "অমন করে কাঁদিস্‌নি বোন। সত্যিই আজ আমি বেশ ভালই আছি। আজ আমার মনে

হচ্ছে,—বুঝি এমন সকাল আমার জীবনে আর কখন এমন হয়ে ফুটে ওঠেনি। আজ যেন আমার সমস্ত প্রাণ ভরে উঠছে। তুই আজ বোন তোর সমস্ত দেহটাকে পবিত্র করে নিয়ে ব্রহ্মচারিণী বেশে আমার রোগ শয্যায়,—আমার শিহরে এসে বসেছিস্। তোরই কোলের কাছে মাথা রেখে,—তোকে প্রাণভরে দেখ্তে দেখ্তে আমার শেষ নিশ্বাস পৃথিবীতে চিরদিনের মত শেষ হয়ে যাবে ;—এর চেয়ে আর মানুষের বেশী কি সুখ হতে পারে বোন ! এর অধিক চাইবার মত আর তো কিছু আমি ভগবানের কাছেও খুঁজে পাইনি। তোকে এই চির দুঃখিনী বেশে, চিরদিন আমায় দেখ্তে হবে। বেঁচে আর আমার লাভ কি বোন ! তার চেয়ে যে মৃত্যু আমার মহা আনন্দের। ভগবানের কাছে শুধু এইটুকু প্রার্থনা করি, জন্মজন্মান্তরে যেন তোরই ভাই হয়ে জন্মাতে পারি। আর তুইও যেন আমার এমনি ধারা বোন হয়ে,—এমনি করে আমার চার পাশে সোণার স্বর্গ গড়ে তুলিস্।"

নরেন্দ্রনাথের সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া আসিল,—কণ্ঠ শুষ্ক হইল, সে আর একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল। নরেন্দ্রনাথের এই করুণ কথা গুলিতে পঙ্কজিনীর সমস্ত শরীর ক্রমেই শিথীল হইয়া আসিতেছিল, সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে একটু দৃঢ় করিয়া, অঞ্চলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে অশ্রু জড়িত কণ্ঠে বলিল, "নরেন দা একটু বেদানার রস খাও। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।"

পঙ্কজিনীর স্বরে নরেন্দ্রনাথ আবার চক্ষু মেলিল। পঙ্কজিনী

তাড়াতাড়ি পেয়ালা হইতে এক চাম্‌ছে বেদানার রস লইয়া নরেন্দ্র-নাথের কণ্ঠে ঢালিয়া দিল,—নরেন্দ্রনাথ অতি কষ্টে তাহা গলধঃকরণ করিল। কাত্যায়নী গৃহের মেঝের উপর বসিয়া নয়নজলে ভাসিতে ছিলেন, পঙ্কজিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌তো পঙ্কী একবার থার্ম্মোমিটারটা দিয়ে,—নরুর এখন জ্বর কত ?"

থার্ম্মোমিটার দিবার কথায় একটা ক্ষীণ হাসি অতি ক্ষীণভাবে নরেন্দ্রনাথের ওষ্ঠের উপর ভাসিয়া উঠিল,—সে জননীর দিকে ফিরিয়া অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "জ্বর এখন কত দেখে আর লাভ কি মা ? এ জ্বব কম্‌বার নয়,—এ জ্বর ছাড়বার নয় মা। এ জ্বর যখন ছাড়বে তখন আর মা তোমায় এমন করে দেখ্‌তে পাবো না। পৃথিবীর সমস্ত আলো চিরদিনের মত আমার চোখের সম্মুখে একেবারে কালো হয়ে যাবে। তোমায় ছেড়ে মা,—কত দূরে চ'লে যাবো। তোমায় আর মা, মা ব'লে ডাক্‌তেও পাবো না।"

পঙ্কজিনী আর একবার অঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া লইল ; ধীরে ধীরে বলিল, "ছি নরেন দা, অমন কথা কি বল্‌তে আছে। ভয় কি আমি বল্‌ছি তুমি ভালো হয়ে যাবে। জ্বর কি কারুর হয় না। ছি অমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে !"

নরেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া রহিল। পঙ্ক-জিনী ধীরে ধীরে থার্ম্মোমিটারটি বাহির করিয়া জ্বরের উত্তাপ কত দেখিবার জন্য সেটা নরেন্দ্রনাথের বগলে দিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই,—কেবল একটা উৎকণ্ঠা যেন সমস্ত গৃহের ভিতর ধড়ফড় করিতে লাগিল। প্রাচীর গাত্রে ব্রাকেটস্থিত ঘড়ী

টিক্‌টিক্‌ করিয়া সময় নিরুপন করিতেছিল, দেখিতে দেখিতে পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হইয়া গেল। পঙ্কজিনী কম্পিত হস্তে থার্ম্মো-মিটারটা বগল হইতে বাহির করিয়া আনিল। কাত্যায়নী মহা উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, " জ্বর এখন কত রে ?"

পঙ্কজিনী কিছুক্ষণ থার্ম্মোমিটারটা নাড়িয়া চাড়িয়া ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া, ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "তিনের কিছু ওপরে।"

"তিনের ওপরে।" কাত্যায়নীর বিশুস্ক মুখখানি আরও যেন একটু ম্লান হইয়া পড়িল। যে শোকের কালিমা ক্রমেই তাঁহার মুখের উপর জড় হইতেছিল, তাহা যেন আরও একটু ঘনীভূত হইয়া উঠিল ; তিনি শুস্ককণ্ঠে বলিলেন, "আজ ক' দিন থেকেই দেখ্‌ছি জ্বরটা একভাবেই রয়েছে। এখনও দেখ্‌ছি একটুও কমেনি।"

জননীর কথায় নরেন্দ্রনাথ আবার একটু মৃদু হাসিল ; মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ জ্বর কমবার নয় মা। যদি কমবার হ'তো তাহ'লে অনেক দিনই মা কমে যেতো। আমি যে মা বেশ বুঝ্‌তে পারছি, আস্তে আস্তে আমার সব শেষ হয়ে আস্‌ছে। মা তুমি অমন করে কেঁদনা, তোমার কান্না যে মা আমি সইতে পারিনি।"

কাত্যায়নীর কণ্ঠ হইতে কোনও উত্তর বাহির হইল না। তিনি অঞ্চল দিয়া কেবল চোখের জল মুছিতে লাগিলেন ! কাহারও মুখে কথা নাই। জননীর মুখের দিকে নরেন্দ্রনাথ চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার চোখের জল নরেন্দ্রনাথের অসহ্য হইল,

সে ধীরে ধীরে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার গাঢ় নিশ্বাস আরও যেন ঘনঘন পড়িতে লাগিল। কাত্যায়নী নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া পঙ্কজিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "পঙ্কী মাঝে মাঝে নরুব মুখে একটু একটু বেদানার রস দিস্,—আমি যাই ততক্ষণ কাপড়টা ছেড়ে আসিগে। নেপালের মহারাজের প্রধান কবিরাজ মশায়ের আজ আবার নরুকে দেখ্‌তে আসবার কথা আছে। উনি তাই সকালে উঠেই সেখানে গেছেন। তারও আস্‌বার সময় হ'লো।"

পঙ্কজিনী কোন উত্তর দিল না,—কেবল একবার ঘাড় নাড়িল। কাত্যায়নী ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল, সহসা চক্ষু মেলিয়া পঙ্কজিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "পঙ্ক, তোর এই বুদ্ধিহীন ভাইটির ওপর রাগ করিস্‌নি বোন,—অভিমান করিস্‌নি। তুই তোর এই বুদ্ধিহীণ ভাইটিকে চালাক করবার অনেক চেষ্টা করিছিলি, কিন্তু তবুও তোর ভাই চালাক হতে পারেনি। এইটুকু শুধু মনে রাখিস্ বোন ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করে থাকেন। আমার মনে হয় বোন আমি ভুল করিনি। তুই আমার চিরদিনের বোন,—জন্ম—জন্ম—আমার বোন হয়ে জন্মাস্। এর বেশী আর আমার অন্য কোন সাধ নেই। ভাই বোন এমন সম্বন্ধ পৃথিবীতে বুঝি আর কিছু হয় না।"

পঙ্কজিনী নীরব,—তাহার সমস্ত দেহটা ধীরে ধীরে যেন পাষাণ হইয়া আসিতে ছিল। সে স্থির ধীর পলকশূন্য দৃষ্টিতে

নরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্রনাথ একটুখানি নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, "দেখ বোন্, আমার তো দিন ফুরিয়ে এসেছে। দু'দিন পরে কোথায় অজানা কত দূরে চলে যাবো তার কিছুই জানিনি, তবু আমার সে জন্যে কোন দুঃখ হচ্ছে না, শুধু আমার বড় দুঃখ মার জন্যে। আমি আমার মাকে জানি,—তার প্রাণ বড় নরম। তিনি এ দুঃখ সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বেন না,—তার বুক ভেঙ্গে যাবে। আমায় হারিয়ে তিনি নিশ্চয়ই পাগল হ'য়ে যাবেন। দেখিস্ বোন তাকে দেখিস্,—আমার মা যেন না দুঃখ পায়। তার কাছে কাছে থেকে তাকে মা বলে ডেকে আমার অভাব জানতে দিস্নি।"

নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ রোধ হইল,—এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু নয়ন কোণে উচ্ছলিয়া উঠিল। পঙ্কজিনী তাড়াতাড়ি অঞ্চলে তাহা মুছাইয়া দিয়া শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল, "ছি নরেনদা তুমি পুরুষ মানুষ—তুমি এত দুর্ব্বল। রোগ হ'লেই যে মানুষ মারা যায়—এ কথা তোমায় কে বলেছে। ব্যম হয়েছে ভালো হয়ে যাবে,—তোমার কি অমন চঞ্চল হওয়া উচিত। তুমি ছাড়া তোমার বাপ মার যে আর কেউ নেই ভাই। ভগবান কখন এত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। আমার মন বল্ছে তুমি ভালো হ'বে,— তুমি আবার সুখী হবে।"

"সুখী হবো।" নরেন্দ্রনাথ মৃদু হাসিল। তাহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ ভাবে বাহির হইয়া আসিল, "সুখী হ'বো! বল্ বোন কেমন ক'রে সুখী হবো? তুই তোর সব সুখ

জলাঞ্জলী দিয়ে—সন্ন্যাসিনী সেজেছিস্, আর আমি সুখী হ'বো! তোর ওই মলিন মুখ, তোর ওই মলিন বেশ, দিন রাত চোখের ওপর দেখে মানুষ কি কখন সুখী হতে পারে? না বোন, আর আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছে নেই।"

পঙ্কজিনী আর এক চাম্‌চে বেদানার রস নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ঢালিয়া দিল,—নরেন্দ্রনাথ অতি কষ্টে আবার সেটুকু গলধঃকরণ করিল। সে আবার কি বলিতে যাইতে ছিল কিন্তু পিতাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একটু পাশ ফিরিয়া শুইল। দেবেনবাবু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, "কবিরাজ মশাই আস্‌ছেন।"

কবিরাজ মহাশয় আসিতেছেন শুনিয়া, পঙ্কজিনী তাড়তাড়ি পালঙ্কের উপর হইতে নামিয়া অবগুণ্ঠনটা মস্তকোপরি ঈষৎ টানিয়া দিয়া, পালঙ্কের পার্শ্বে রক্ষিত একখানা টিপয়ের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল। দেবেনবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কবিরাজ মহাশয়ও গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া ছিলেন, তিনি নরেন্দ্রনাথের আপাদ মস্তক একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া নরেন্দ্রনাথের শিয়রের নিকট উপবিষ্ট হইলেন।

কবিরাজ মহাশয় প্রাচীন, লোকটীকে দেখিলেই মহা বিজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়। বয়সাধিক্যে মস্তকের সমস্ত চুল গোঁপ দাড়ী সবই সাদা হইয়া গিয়াছে। পরিধানে সাদা ধুতি, উপর অঙ্গে একটা সাদা আল্‌খাল্লা। তিনি নরেন্দ্রনাথের মস্তকের নিকটে বসিয়া অতি মধুর স্বরে বলিলেন, "দেখি বাবা তোমার হাতটা একবার।"

নরেন্দ্রনাথ চক্ষু মেলিল, তাহার মনে হইল তাহাকে রোগ যন্ত্রনা হইতে মুক্তি দিবার জন্য যেন এক ঋষি আসিয়া তাহার মাথার নিকটে বসিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথকে চক্ষু মেলিতে দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় তাহার নাড়ীটী পরীক্ষা করিবার জন্য ধীরে ধীরে তাহার ডান হাতখানি তুলিয়া লইলেন। সকলেই একটা উৎকট আগ্রহ লইয়া কবিরাজ মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রায় দশ মিনিট কাল কবিরাজ মহাশয় নরেন্দ্রনাথের নাড়ী পরীক্ষার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেবেনবাবু বেশ একটু ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখলেন?"

কবিরাজ মহাশয় অতি মৃদু স্বরে উত্তর দিলেন, "রোগ কঠিন সে বিষয়ে আর সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। আমি এখন চল্লুম! বৈকালে আবার আসবো, একটু চিন্তা করে সেই সময় ওষুধের ব্যবস্থা কর্বো।

দেবেনবাবু মহা মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "যে আজ্ঞে! আপনার দয়া আমরা জীবনে কখন ভুলবো না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পশ্চিমের বৈকালের চড়া রৌদ্র একেবারে ম্লান না-হইলেও অনেকটা নরম হইয়া পড়িয়াছিল। সূর্য্যদেব পশ্চিম কোণে দাঁড়াইয়া সমস্ত রশ্মিজাল নিজের ভিতর গুটাইয়া লইয়া ক্রমেই রক্তিম মূর্ত্তি ধারণ করিতেছিলেন। দক্ষিণে বাতাস চারিদিক হইতে এলোমেলো ভাবে বহিয়া যাইতেছিল। গৃহের ভিতর পাঁচটি প্রাণী, কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেই নীরব, সকলেরই মুখে একটা কালো ছায়া বেশ একটু কালো হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহুদূর হইতে কেবল যমরাজের কালো মহিষটার বিকট গর্জ্জন এলোমেলো বাতাসের ভিতর দিয়া ভাসিয়া আসিয়া আশঙ্কায় সমস্ত ঘরখানাকে যেন মাঝে মাঝে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছিল।

নরেন্দ্রনাথের চক্ষু দুইটী মুদ্রিত,—তাহার দ্রুত নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘনঘন পড়িতেছে। তাহার শিয়রে কাত্যায়নী,—অবগুণ্ঠনটা বেশ একটু টানিয়া দিয়া, পুত্রের ম্লান মুখখানির দিকে আকুলভাবে চাহিয়া আছেন। নরেন্দ্রনাথের পায়ের নিকট পঙ্কজিনী, পালঙ্কের পার্শ্বস্থিত একখানি টিপায়ে ঠেস্ দিয়া, ঈষৎ অবগুণ্ঠনে মুখখানি ঢাকিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেবেনবাবু বিশুষ্ক মুখে পালঙ্কের ছত্রীটা ধরিয়া বৃদ্ধ কবিরাজের গম্ভীর মুখখানার দিকে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া আছেন। তাঁহারই সম্মুখে একখানা বেতের মোড়ার উপর কবিরাজ মহাশয় উপবিষ্ট, তাঁহারও চক্ষু দুইটী মুদ্রিত। কি

যেন একটা বিশেষ চিন্তায় তাঁহার সমস্ত মুখখানা ক্রমেই গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিল। দেবেনবাবুর প্রাণের ভিতর শত প্রশ্ন কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ক্রমাগতই কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইতে ছিল না। প্রায় পোনর মিনিট অতিবাহিত হইবার পর কবিরাজ মহাশয় ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিলেন, একবার নরেন্দ্রনাথের মুখের উপর একটা তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "দেখুন এ জ্বরের ওষুধ হওয়া কঠিন,—কঠিন কেন অসম্ভব বল্লেই হয়। আপনার পুত্রের যে জ্বর হয়েছে এ জ্বর বড়ই বিষাক্ত। এ জ্বরের বীজাণু শরীরের রক্তের সঙ্গে মেশবামাত্রই দেহের সমস্ত রক্ত ধীরে ধীরে শুষ্ক হ'তে থাকে। কাজেই রোগীকেও ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হ'তে হয়। নেপালে এই জ্বরকে 'আউল জ্বর' বলে, এক সময় এই জ্বরের জ্বালায় নেপাল ছারখাবে যেতে বসেছিল। সেই সময় এই রোগ নেপাল থেকে তাড়াবার জন্যে চেষ্টার ক্রুটী কিছুই হয়নি,—জ্বরের শাস্ত্রে যত রকম ওষুধ হ'তে পারে তার সমস্তই প্রয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে কোনই ফল ফলেনি। এই আউল জ্বরে শাস্ত্রে কোন ওষুধ নেই,—যাওবা আছে তা হওয়া অসম্ভব। কাজেই বল্‌তে হয় এই আউল জ্বরের চিকিৎসা নেই।"

কবিরাজ মহাশয় নীরব হইলেন। সকলেই উৎকণ্ঠ হইয়া কবিরাজ মহাশয়ের কথাগুলি শুনিতেছিল। সমস্ত বুকখানা ভাঙ্গিয়া

চুরিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া একটা আকুল দীর্ঘশ্বাস দেবেনবাবুর নাসিকা পথে বাহির হইয়া আসিল, তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটীও কথা বাহির হইল না। তিনি বুকখানা দুই হস্তে চাপিয়া ধরিলেন। অবগুণ্ঠনের ভিতরে কাত্যয়নীর দুই গণ্ড বহিয়া নীরব বেদনার কাতর অশ্রু ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পঙ্কজিনী পাষাণের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, একটা দ্রুত বেদনার তীব্র স্পন্দনে তাহার সমস্ত দেহটা একবার মাত্র দরদর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে কবিরাজ মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া অতি ধীরে স্থির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এ রোগের ওষুধ তৈরী হওয়া কঠিন কেন? ওষুধ যখন আছে তখন কঠিন হক্ তৈরী নিশ্চয়ই হয়। হক্ কঠিন আপনি দয়া করে সেই কঠিন ওষুধই তৈরী করে দিন। আমার নরেনদার প্রাণ বাঁচান। আপনি যখন আমাদের ওপর দয়া করে এত কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন তখন আর একটু দয়া করে আমার নরেনদার প্রাণ রক্ষা করুন, সেই কঠিন ওষুধ তৈরী করে দিন।"

পঙ্কজিনার সেই বেদনা মিশ্রিত করুণস্বরে বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয়ের গম্ভীর মুখখানা বেশ একটু ম্লান হইয়া পড়িল। তিনি ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া পঙ্কজিনীর দিকে চাহিলেন। বৈকালের ম্লান রৌদ্র ম্লান হইয়া গবাক্ষের ভিতর দিয়া আসিয়া পঙ্কজিনীর ম্লান মুখখানির উপর পড়িয়াছে। এলায়িত রুক্ষ কেশ পায়ের গোড়ালীর নিকট আসিয়া মৃদু পবনে দুলিতেছে। শুভ্র থান একটা নিবিড় শোকের পবিত্র স্মৃতি যেন সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া

রাখিয়াছে। এই শুভ্র পবিত্র কিশোরীর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কবিরাজ মহাশয়েরও দুই নয়ন আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার মৃদু কণ্ঠস্বর অতি মৃদুভাবে বাহির হইয়া আসিল, "মা, আমার যদি শারীরিক একটু পরিশ্রমে সে ঔষধ প্রস্তুত করা সম্ভব হ'তো, সে পরিশ্রম টুকু কর্ত্তে বৃদ্ধ কখনই কাতর হ'তো না। একটু পরিশ্রম কল্লেই যদি একজন লোক বাঁচতো, তাহ'লে সেটুকু পরিশ্রম কর্ত্তে কখন কোন দিন কি কোন মানুষ বিমুখ হ'তে পারে? মা তুমি ঠিক আমার কথা বুঝতে পারনি। সে ওষুধ প্রস্তুত কর্ত্তে হ'লে যে অনুপানের প্রয়োজন সে অনুপান সংগ্রহ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সে অনুপান মা পাওয়া যায় না।"

পঙ্কজিনী স্থির দৃষ্টিতে কবিরাজ মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতেছিল, কবিরাজ মহাশয় নীরব হইবামাত্র সে আবার প্রশ্ন করিল, "এমন কি অনুপান যা পাওয়া সম্ভব নয়। একটু চেষ্টা করে খুঁজলে নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। যা টাকা লাগে, যত টাকা লাগে সে জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না; আপনি দয়া করে সেই অনুপানটা সংগ্রহ করুন। আমার নরেনদাদাকে রক্ষা করুন।"

পঙ্কজিনীর কথায় একটা মৃদু হাসি কবিরাজ মহাশয়ের মুখের উপর ভাসিয়া উঠিল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা অর্থ বিনিময়ে সে অনুপান সংগ্রহ হয় না। সামান্য অর্থ ব্যয় কল্লেই যদি সে অনুপান সংগ্রহ হ'তো তাহ'লে তা পাওয়া সম্ভব নয় এ কথা বলবো কেন মা। সত্যই সে অনুপান সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন।

তবে যদি তা সংগ্রহ হয়, তাহ'লে আমি জোর করে বল্‌তে পারি, সে ওষুধ প্রয়োগে এ ব্যাধি নিশ্চয়ই নিরাময় হবে। সে ওষুধ প্রয়োগের পর রোগীর মৃত্যু অসম্ভব। এ রোগে রোগীর আর কিছুতেই প্রাণনাশ হতেই পারে না।"

একটা প্রবল উত্তেজনায় পঙ্কজিনীর সমস্ত মুখখানি একেবারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে মহা উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "যেমন করেই হক্ সে অনুপান সংগ্রহ কর্ত্তেই হবে। বলুন আপনি সে অনুপান কি ?"

কবিরাজ মহাশয় পঙ্কজিনীর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা বিচলিত হওনা, বিচলিত হ'লে মানুষ বাঁচে না। সে অনুপান সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সে ওষুধ প্রস্তুত কর্ত্তে হ'লে, মানুষের তাজা চল্লিশ তোলা রক্তের প্রয়োজন। মানুসের তাজা রক্ত চল্লিশ তোলা পাওয়া কি সম্ভব মা! সম্ভব নয়, কাজেই এ রোগের ওষুধও নেই।"

পঙ্কজিনী বাহ্যজ্ঞান হারাইল। নরেনদাদাকে রক্ষা করিবার জন্য তখন তাহার সমস্ত প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল ;—সে কঠিন কণ্ঠে বলিল, "এ অনুপান সংগ্রহ করা এমন কি কঠিন কাজ। চল্লিল তোলা মানুষের রক্ত হ'লেই যদি নরেনদা আমার বাঁচে, তাহ'লে সে অনুপান সংগ্রহ হওয়া বিশেষ কিছুই কঠিন নয়। বলুন নরেনদা আমার বাঁচবে, সে অনুপান আমি সংগ্রহ করে দিচ্ছি।"

পঙ্কজিনীর কথাগুলি বীণার ধ্বনির মত নরেন্দ্রনাথের কর্ণের

ভিতর যেন মধু বর্ষণ করিল। সে একবার একটা গাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। সে ক্ষীণ কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "পঙ্ক।"

নরেন্দ্রনাথের সে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠস্বর বোধ হয় পঙ্কজিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল না। কবিরাজ মহাশয়ের একটা কথা শুনিবার জন্য তখন তাহার সমস্ত প্রাণ একেবারে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, অন্য কিছু শুনিবার তাহার আর অবসর ছিল না। সে কবিরাজ মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া পুনঃবায় দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "বলুন, নরেনদা আমার বাচবে, চল্লিশ তোলা মানুষের তাজা রক্ত সংগ্রহ হওয়া কঠিন হবে না। আপনি শুধু একবার বলুন নরেনদা আমার বাঁচবে।"

কবিরাজ মহাশয় প্রাচীন ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। চিকিৎসা করিতে যাইয়া তিনি অনেক লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, অনেক লোকের সহিত মিশিয়াছেন, পঙ্কজিনীর উত্তেজনা পূর্ণ কণ্ঠে, কথার ভাবে তাহার মনের উদ্দেশ্যটুকু বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। এই কিশোরী যে নিজের দেহের রক্ত দিয়া এই যুবককে নিরাময় করিতে চায় সেটুকু তিনি বুঝিলেন। পঙ্কজিনীর মুখ চোখের ভাবে তিনি বেশ একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি বেতের মোড়াটার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "তোমার নরেনদা যে বাঁচবে এ কথা সত্য কিন্তু মানুষের রক্ত পাওয়া কি সম্ভব মা! বিচলিত হওনা মা, এ বুড়োর কথা গুলো একটু স্থিরভাবে শোন। যদি কেউ উত্তেজনার বশে, নিজের আত্মীয়ের প্রাণরক্ষার জন্যে

নিজের দেহের রক্ত দিতে চায় আমরাতো তা নিতে পারিনি মা ; এ ঠাকুরের কাছে বুক চিরে রক্ত দেওয়া নয় মা, এতে জীবনের বিশেষ আশঙ্কা আছে। চল্লিশ তোলা রক্ত যদি কোন মানুষের শরীর থেকে নেওয়া হয় তা'হলে সে মানুষ কিছুতেই বেঁচে থাক্‌তে পারে না। একজনের প্রাণ বিনিময়ে অপরের প্রাণ রক্ষা কি সম্ভব মা, আর তা সম্ভব হ'লেও রাজার আইন তা শুনবে কেন? এক জনের প্রাণ রক্ষার জন্যে আর একজনের দেহের রক্ত নিলে রাজার আইনে গুরুতর অপরাধ হয়,—তার দণ্ড তো সহজ নয় মা।"

নরেন্দ্রনাথ একটা আকুল দৃষ্টি লইয়া পঙ্কজিনীর সেই উদ্দীপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া ছিল, সে দেখিল বৈকুণ্ঠের সমস্ত আলো আসিয়া সেই মুখখানিকে একেবারে উজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। সে মুখখানি স্বর্গের শত মাধুরীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। সে কাতর কণ্ঠে আবার ডাকিল, "পঙ্ক, বোন আমার ;—অবুঝ হ'স্‌নে বোন। তুই আমার চোখের সামনে যে বৈকুণ্ঠের আলো এনে ধরিছিস্, তা ফুরিয়ে যাবার আগেই আমার যেন সব শেষ হয়ে যায়। তুই আমার আজ এমন বোন সেই গর্ব্বে আমার সমস্ত প্রাণ ফেটে ভেঙ্গে যাবার মত হ'য়েছে। এ সময় তুই বোন অবুঝ হস্‌নে। আমার মা বাপের ভার তোর হাতে দিয়ে চল্লুম, দেখিস্ বোন তাদের দেখিস্। তুই শান্তিময়ী হয়ে তাদের বুকের ব্যথা ধুয়ে মুছে দিস। আমার মাকে মা ব'লে ডেকে আমার অভাব ভুলিয়ে রাখিস্।"

নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল, সে একেবারে নির্জ্জীব

হইয়া পড়িল; নিশ্বাস ঘনঘন পড়িতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের কাতর কণ্ঠস্বরে পঙ্কজিনী নরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। নরেন্দ্রনাথের কথাগুলি তাহার দেহের পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যেন বিদ্যুতের মত তরতর করিয়া বহিয়া গেল। তাহার বিহ্বল দৃষ্টি একবার গৃহের চারিদিকে পতিত হইল। আপেল ও বেদানা কাটিবার জন্য একখানা প্রকাণ্ড ছুরি টিপয়ের উপর রক্ষিত ছিল, সেখানা একেবারে তাহার দৃষ্টির সম্মুখে যেন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। সে নিমিষে সেখানা তুলিয়া লইয়া একেবারে সজোরে বুকের ঠিক মাঝখানে বসাইয়া দিল। শাণিত ছুরিকা সজোর আঘাতে একেবারে হৃদপিণ্ড ভেদ করিল। পঙ্কজিনার সমস্ত দেহটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া দৃঢ়হস্তে ছুরিখানা বুক হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। সঙ্গে সঙ্গে তীব্রবেগে রক্ত ফিনকি দিয়া ছুটিল। তাহার শিথিল হস্ত হইতে ছুরিখানা মেঝের উপর খসিয়া পড়িল।

পঙ্কজিনাকে ছুরি তুলিতে দেখিয়াই নরেন্দ্রনাথ লাফাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার দুর্ব্বল শরীর অদ্ধোত্থিত হইয়াই শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। কেবল একটা অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণভাবে বাহির হইয়া আসিল, "একি কল্লি বোন।"

পঙ্কজিনার সমস্ত শরীর ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সে সবলে পালঙ্কের ছত্রী চাপিয়া ধরিয়া কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, "অনুপান নিন, ওষুধ তৈরী করুন, আমার নরেনদাকে বাঁচান। বিচলিত হবেন না, বিচলিত হ'লে

মানুষ বাঁচে না। রক্ত নিন্, ওষুধ তৈরী করুন, আমার নরেন-দাদাকে বাঁচান।"

ক্রমাগত রক্ত তীরবেগে ফিন্‌কি দিয়া বাহির হইতে ছিল। সমস্ত গৃহ রক্তের স্রোতে ভাসিতে লাগিল। প্রচুর রক্তপাতে পঙ্কজিনীর সমস্ত শরীর ক্রমেই শিথীল হইয়া আসিতেছিল, তাহার হস্ত শিথীল হইয়া পালঙ্কের ছত্রী হইতে খসিয়া পড়িল। তাহার পদদ্বয় ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহারা যেন আর কিছুতেই তাহার দেহটাকে খাড়া করিয়া রাখিতে পারিতে ছিল না। আর একটু হইলেই তাহার দেহ মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িত। দেবেনবাবু তাড়াতাড়ি যাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। রক্তে তাঁহার সমস্ত দেহ ভরিয়া গেল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয় একেবারে মোড়া ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়াছিলেন। ভায়ের জন্য ভগ্নির এত বড় আত্মোৎসর্গ তিনি আর জীবনে কখনও দেখেন নাই। এই ব্যাপারে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। পঙ্কজিনীর স্বরে তাঁহার যেন চৈতন্য হইল, তিনি একটা বড় রকম নিশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সত্যিই মা তুই এমনি ক'রে নিজের রক্ত ঢেলে দিলি। যদি এখন তোর শোনবার ক্ষমতা থাকে তবে শোন মা, আমি বিচলিত হইনি। তোর তাজা রক্তে যে ওষুধ তৈরী কর্ব্বো, তাতে যমেরও সাধ্য নেই যে তোর নরেনদাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। তুই নিশ্চিন্তে বুড়োর কথায় বিশ্বাস ক'রে বৈকুণ্ঠে চলে যা। তোর নরেনদা বাঁচবে,—বাঁচবে,—বাঁচবে।"

পঙ্কজিনীর শেষ নিশ্বাস বড় জোরে একবার বাহির হইয়া আসিল। সে দেবেনবাবুর বক্ষের উপর ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল। ঠিক সেই সময় দরজা ঠেলিয়া নরেন্দ্রনাথের শ্বশুর মহাশয় লালিত্যময়ীকে সঙ্গে লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দরজা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে গোধূলীর একরাশ অন্ধকার গৃহেব ভিতর প্রবেশ করিয়া হা হা করিয়া যেন একটা বিকট বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল।
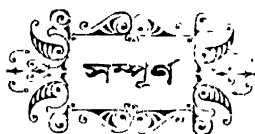
লক্ষ্মীবিলাস পাবলিসিং হাউস হইতে

প্রকাশিত—

কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

অপরাধিনী

সচিত্র সুন্দর সামাজিক উপন্যাস রেশমে বাঁধা মূল্য—১৷৷০

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

অভিমান

সচিত্র সুন্দর সামাজিক উপন্যাস রেশমে বাঁধা মূল্য—১৷৷০

মনির বর

সচিত্র সুন্দর সামাজিক উপন্যাস রেশমে বাঁধা মূল্য—১৷৷০

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

কালের কোলে

অতি অপূর্ব্ব সুন্দর পারিবারিক উপন্যাস মূল্য—১৲

গ্রন্থকারের পুস্তকাবলী

১।	পাষানে প্রাণ	...	...	১৲
২।	রঙ্গ বারিধি	...	...	১৲
৩।	বিয়ের হাসি	...	...	।/০
৪।	একে আর	...	...	।/০
৫।	কুলবধূ ...	...	...	১৲
৬।	সতীর স্বর্গ	...	...	১।০
৭।	মিলন	...	...	১৲
৮।	ঘরের লক্ষ্মী	...	...	১॥০
৯।	সঙ্গিনী	...	...	১৲
১০।	বিয়ের কনে	...	...	১॥০
১১।	বঙ্গ-বালা	...	...	১॥০
১২।	বিধির বিধি	...	..	১।০
১৩।	কালের কোলে	...	...	১৲
১৪।	গৃহ বিচ্ছেদ	...	...	১॥০